নানারূপে সতীঅঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ

সুগত পাইন

সতীপীঠ। আজও পরম কৌতুহল ও অপার রহস্যের এক অমীমাংসিত যাত্রাপথ। শিবহীন দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞ নাশের পৌরাণিক আখ্যান কাহিনির বীজ থেকে তান্ত্রিক পীঠ মাহাত্ম্য মহীরূপ ক্রমবিস্তার লাভ করেছে। সতীর দেহ স্কন্ধে স্থাপনপূর্বক শিবের তাণ্ডব ও বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহপাত-এর গল্প আমাদের সবার জানা। সতী অঙ্গের একান্নটি খণ্ড থেকে একান্ন সতীপীঠের উদ্ভব। প্রতিটি পীঠে স্বয়ং ভগবতী ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিরাজিতা। ভক্তি আর কৌতূহলকে পাথেয় করে দলে দলে মানুষ পীঠগামী হয়েছে। আর সমস্যা সেখানেই। পীঠ মাহাত্ম্যের আকর তন্ত্রশাস্ত্র পীঠগুলির কোনও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করেননি। এক একটি গ্রন্থে পীঠের সংখ্যা বিভিন্ন। পরস্পর বিরোধিতাও বিরল নয়। এই বিভ্রান্তি প্রকৃত পীঠস্থান নির্ণয়ের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা। লৌকিক মত ও শাস্ত্রীয় মতের বিভিন্নতা আর এক প্রতিকূলতা। তাই সংশয়ের গোলকধাঁধায় অনুসন্ধানকারীকে প্রতি মুহূর্তে পথ হারাতে হয়। পূর্বজদের সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রীয় নির্দেশকে সম্বল করে পশ্চিমবঙ্গের সতীপীঠগুলিকে আরও একবার পরিক্রমা।

১. দেবী কালিকা (কালীঘাট)

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় সতীপীঠ, কালীঘাট। অথচ প্রাচীন কোনও তন্ত্রগ্রন্থে এর নাম নেই। সতীপীঠ কালীঘাটের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় তন্ত্র চূড়ামণি গ্রন্থে। পীঠ নির্ণয় তন্ত্রের ঊনবিংশ পীঠ হল কালীঘাট—

"নকলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপদাঙ্গুলি চ মে।
সর্বসিদ্ধিকারী দেবী কালিকা তত্র দেবতা।।"

অর্থাৎ কালীঘাটে সতীর দক্ষিণপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত চারটি আঙুল পড়েছে, দেবী এখানে কালিকা, ভৈরব নকুলেশ। তবে পীঠমালা তন্ত্র মতে এখানে সতীর বামহস্তের অঙ্গুলি পতনের সংবাদ আছে—

"...সতী দেব্যা শরীরতঃ।
বামভূজাঙ্গুলি পাতো জাতো ভাগীরথী তটে।।"

নিগমকল্পের পীঠমালায় গঙ্গাতটের ধনুকাকৃতি স্থানকে কালীঘাট বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে কালীঘাটকে কাশীর ন্যায় পুণ্যভূমি রূপে নির্দেশ করা হয়েছে—

"নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র যত্র গঙ্গা বিরাজিতা।
তত্র ক্ষেত্র মহাপুণ্যং দেবণামপি দুর্লভং।।"

বৃহন্নীল তন্ত্রেও কালীঘাটকে মহাপীঠের আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সাতজন সিদ্ধযোগীর একজন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রথম সাধনক্ষেত্র ছিল কালীঘাট। তখন দেবী পর্ণকুটিরে পূজিতা হতেন। আত্মারাম ব্রহ্মচারীও ব্রহ্মানন্দগিরি দেবীর স্বপ্নাদেশ মতো ব্রহ্মশিলা (দৈর্ঘ্য ১২ হাত, প্রস্থ ২ হাত, বেধ ১½ হাত) উক্ত ব্রহ্মশিলাতেই চোখ, মুখ অঙ্কন করে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেবী অঙ্গ ব্রহ্মশিলার নিচে কুঠরিতে রক্ষিত। তার দর্শন নিষিদ্ধ। প্রতি বছর স্নানযাত্রার দিন বয়োজ্যেষ্ঠ সেবায়েতরা চোখে কাপড় বেঁধে এই পবিত্র অঙ্গকে মধু ইত্যাদি দিয়ে স্নান করিয়ে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করেন। মন্দিরের পূর্বদিকে রয়েছে কালীকুণ্ড। দেবীর প্রথম মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন যশোরের রাজা বসন্ত রায়। বর্তমান মন্দিরটি ১৮০৬ খ্রি. বড়িসার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায়। দেবীর যে বিশাল সোনার জিভ সেটি দিয়েছিলেন পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। কালীঘাটের মা কালী অত্যন্ত জাগ্রতা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সারদামণি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সবাই এসেছেন এই মহাতীর্থে।

২. দেবী যোগাদ্যা (ক্ষীরগ্রাম)

পীঠ নির্ণয় গ্রন্থর মতে অষ্টাদশ পীঠ হল ক্ষীরগ্রাম—

"ক্ষীরগ্রামে মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীরগ্রাম
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদোমম।।"

যদিও কোনও কোনও গ্রন্থে গ্রামের নাম যোগাদ্যা ও দেবীর নাম মহামায়া বলে উল্লিখিত হয়েছে। ক্ষীরগ্রাম, এই গ্রাম নামটির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় 'কুব্জিকাতন্ত্রে'। আবার জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে 'ক্ষীরিকা', বৃহন্নীলতন্ত্রে 'ক্ষীরপীঠ', ব্রহ্মনীলতন্ত্রে 'ক্ষীরপুর' নাম দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক ড. দীনেশচন্দ্র সরকার ক্ষীরিকা, ক্ষীরপীঠ, ক্ষীরপুর ও ক্ষীরগ্রামকে সমার্থক স্থাননাম বলে অভিমত দিয়েছেন। সে যাই হোক, মধ্যযুগ থেকে ক্ষীরগ্রামের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের হাত ধরে। প্রচলিত মতানুসারে এহেন ক্ষীরগ্রামে সতীর দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়েছিল, এখানে দেবীর নাম যুগাদ্যা, মতান্তরে যোগাদ্যা এবং ভৈরব হলেন ক্ষীরকণ্ঠক/ক্ষীরখণ্ডক। এর বিপরীত মতও রয়েছে—

১. এশিয়াটিক সোসাইটির ৩৪০০ নম্বর পুঁথিতে (মহাপীঠ নিরুপণম) বলা হয়েছে সতী অঙ্গের বাম পদাঙ্গুলি ক্ষীরগ্রামে পতিত হয়েছিল—

"ভূতধাত্রী মহামায়া বাম পদাঙ্গুলি মম"

২. তন্ত্রসার গ্রন্থে ক্ষীরিকাপীঠে বাম পদাঙ্গুলি পতনের উল্লেখ আছে—

"ক্ষীরিকা পীঠায় নামো বাম পদাঙ্গুলীমূল"

৩. আর কবিকঙ্কন মুকুন্দ সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কথা শুনিয়েছেন—

"ক্ষীরগ্রামে করিলা বিশ্রাম।
তাহে পৃষ্ঠদেশ পড়ে দেবের আনন্দ বাড়ে
যোগাদ্যা হইল তার নাম।।"

ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে সতীপীঠ ব্যতীতও এর মাহাত্ম্য বেশ প্রাচীন। বাংলার কবি কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালিতে আছে (লঙ্কাকাণ্ড, মহীরাবণবধ পালা)—দেবী যোগাদ্যা পাতালে মহীরাবণ-এর কুলদেবী ছিলেন। মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধের পর দেবী হনুমানকে বললেন—

"সাধিয়া রামের কার্য চলিলা সত্বর।
কে করিবে সেবা মোর পাতাল ভিতর।।"

তখন হনুমান দেবীর নির্দেশ মতো পৃথিবীর মধ্যস্থল ক্ষীরগ্রামে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতের শান্তিপর্বেও হনুমান কর্তৃক দেবী যোগাদ্যাকে পাতাল থেকে উদ্ধার ও ক্ষীরগ্রামে স্থাপনার কথা দৃষ্ট হয়। এই কাহিনিকে ভিত্তি করে মধ্যযুগের একাধিক কবি (বাঞ্ছারাম বিদ্যারত্ন, দয়ারাম, মধুসূদন) যোগাদ্যা বন্দনা বিষয়ক পুঁথি রচনা করেছিলেন। দেবী যোগাদ্যার শাঁখা পরার জনশ্রুতিও বিখ্যাত। বর্ধমান ও সন্নিহিত অঞ্চলের বিস্তৃত ভূমিভাগে ন্যূনতম ২৫টি স্থানে যোগাদ্যা নামধারী গ্রাম্যদেবীর সন্ধান মিলেছে। অর্থাৎ একসময়ে এইসব অঞ্চলের মধ্যে যোগাদ্যা কাল্ট/সংস্কৃতি যে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনুমান করা যায়। তবে যোগাদ্যা সাংস্কৃতিক বলয়ের পীঠস্থান ক্ষীরগ্রাম সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণত পীঠদেবী তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রে একমেবাদ্বিতীয়ম, কিন্তু যোগাদ্যা সেক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী।

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা সারাবছরই জলতলবাসিনী। বছরে মাত্র ৭ দিন দেবীকে জল থেকে উত্তোলনের প্রথা আছে। অক্ষয়নবমী, বিজয়া দশমী, ১৫ পৌষ, মিত্র সপ্তমী, বৈশাখ সংক্রান্তির দুইদিন পূর্বে 'পাটনাড়ানো'—এই ৫টি পর্বে দেবীর বিশেষ পার্ষদ ভিন্ন জনসাধারণের দর্শনাধিকার নেই। কেবল বৈশাখ সংক্রান্তি ও ৪ জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ভক্তমণ্ডলী দেবীর দর্শনলাভ করেন। দেবী জলতলবাসিনী কেন? মহীরাবণ বধ পালায় আছে মহীরাবণের বধের পর তাঁর পত্নী ক্ষোভবশত দেবীকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন—

"রাণী বলে এই ছিল যোগাদ্যার মনে।
এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে।।
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে।
নর বানরের প্রাণ লব শেষকালে।।"

তবে একটি বাস্তব কারণ ও আমাদের নজর এড়ায় না। সেটি হল ক্ষীরগ্রামে কালাপাহাড়-এর আগমন। তার স্বাক্ষী স্বয়ং যুগাদ্যার ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। ক্ষীরদিঘির ঈশান কোণে দেবীর ভৈরবের মন্দির। হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড়ের তরবারির আঘাতে শিবলিঙ্গের মস্তক দ্বিধাবিভক্ত হয়, সেই ক্ষত ধারণ করে ভৈরব আজও দেবীর রক্ষাকার্যে জাগ্রত রয়েছে। তাহলে কি

কালাপাহাড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচতে সেবায়েতরা দেবীকে মন্দির-সংলগ্ন ক্ষীরদিঘিতে নিমজ্জিত করেছিলেন? কালাপাহাড়োত্তর কালে ও যা প্রচলিত আছে। কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষার্থে দেবীকে জলবাসিনী করার ঘটনা দেবীর মাহাত্ম্যের পরিপন্থী। তুলনায় দেবী জলতলপ্রিয়া এরূপ ধারণা রামায়ণ কাহিনির সঙ্গে ক্ষীণ সম্পর্কযুক্ত ও দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। হনুমান কর্তৃক স্থাপিত পাতালবাসিনী দেবীর বিগ্রহের সন্ধান মেলেনি। তবে ক্ষীরদিঘি থেকে প্রাপ্ত কষ্টিপাথর থেকে স্থানীয় রাজা নরসিংহ দেবীর স্বপ্নাদেশ মতো সিংহবাহিনী দশভূজার মূর্তি নির্মাণ করান দাঁইহাটার শিল্পী নবীন ভাস্করকে দিয়ে। তবে নবীন ভাস্করের পূর্বে যে দেবীর বিগ্রহ ছিল তার প্রমাণ আছে। সে সম্পর্কে কিংবদন্তি রয়েছে। দেবী রাজা হরিদত্তকে নরবলি দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন—'মোর পূজা কর নিত্য র্দিয়া নরবলি' এবং প্রতি বছর বার্ষিক পূজা (বৈশাখ সংক্রান্তি)তে আজ নরবলির বিকল্প হিসাবে নররক্তদানের (স্বগাত্র রুধির) প্রথা আছে। একবার নর-এর অভাবে বলি বন্ধ হয়, তখন পূজারির পুত্রকে বলিদানের ব্যবস্থা হল, রাতে পূজারি পলায়ন করলে দেবী পথমধ্যে দর্শন দিয়ে বললেন—'যার ভয়ে পালাইছ সেই দেবী আমি'। এবং দেবী অভয়দান করলেন যে আজ থেকে আমার মন্দিরে নরবলি রহিত হল। আমি ভদ্রকালী রূপ ত্যাগ করে দশভূজা দুর্গারূপ ধারণ করব। সেইমতো রাজা নবীন ভাস্করকে দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করালেন। এটি নেহাত গল্প কথা হলেও এর মধ্যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বীজ নিহিত আছে।

ক্ষীরগ্রামে দেবীর ৪টি মন্দির রয়েছে। ১টি ক্ষীরদিঘির মধ্যে, যার মধ্যে দেবী সারা বছর নিমজ্জিত থাকেন। উত্থানমন্দির—যেখানে বার্ষিক পূজার দিন ভক্তরা দেবীকে দর্শন ও স্পর্শের সুযোগ পান। যোগাদ্যাবাড়ি (মূল মন্দির)—এইস্থানে দেবীর উদ্দেশ্যে নৈমিত্তিক ভোগ রাগ ও পূজা নিবেদিত হয়। স্থানটি চারপাশের তুলনায় উঁচু, অনেকটা কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায়। এর উত্তরে ব্রাহ্মণী নদী আছে। ক্ষীরদিঘিকে কুণ্ড বলা চলে। অর্থাৎ পীঠ হওয়ার সমস্ত তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষীরগ্রামে সুলভ। চতুর্থ মন্দিরটি অধুনা নির্মিত। ক্ষীরদিঘির পাড়ে দেবীর জলনিবাস মন্দিরের পাশে অবস্থিত। স্থানীয় অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত দশভূজা প্রস্তরময়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এঁরও নিত্যপূজা হয়।

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ব্যাপক ও বিস্তৃত ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, যা অন্য কোনও পীঠদেবীর ক্ষেত্রে নজরে পড়ে না। এদিক থেকেও ক্ষীরগ্রাম স্বতন্ত্র। 'গুয়াডাক', 'মোর নাচ', 'ধল অম্বল', 'ব্যাঙচ্যাঙ', ডোম চোরাড়ি', 'নদের মশাল', 'পাটা নাড়ানো' ইত্যাদি সেইরকমই কিছু লৌকিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও দেবীর বিশেষ কতকগুলি আদেশ ক্ষীরগ্রামবাসী মেনে চলেন—১. ক্ষীরগ্রামে প্রতিমা করে দুর্গাপূজা হবে না, ২. বৈশাখ মাসে হলকর্ষণ, মৃত্তিকাখনন, দীপ বর্ত্তিকা প্রস্তুত, তণ্ডুল উৎপাদন, মস্তকে ছত্রধারণ, এক শয্যায় স্বামী-স্ত্রীর শয়ন নিষিদ্ধ, ৩. ক্ষীরগ্রামে কেউ উত্তরদুয়ারী ঘর নির্মাণ করতে পারবে না। প্রবীণরা দেবীর নির্দেশ আজও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন তবে নবীন প্রজন্ম এইসব বিধি বিধানের খুব এটা ধার ধারেন না। কাঁচা ছোলা ও পাটালি দেবীর পূজার প্রধান

উপকরণ। প্রত্যহ মৎস্য সহ অন্নভোগ নিবেদিত হয়। বার্ষিক পূজায় ছাগ, মেঘ, মহিষ বলিদান হয়। বলির রুধির ক্ষীরদিঘির জলে নিবেদিত হয়।

ক্ষীরগ্রাম বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বর্ধমান স্টেশন থেকে কাটোয়াগামী বাসে দেড় ঘণ্টার পথ কৈচর। কৈচর থেকে ৫ কি.মি. দূরে ক্ষীরগ্রাম। বাস, অটো, ভ্যান রিক্সা পর্যাপ্ত। মন্দির কমিটি বর্তমানে রাত্রিবাসের জন্য যাত্রীনিবাস নির্মাণ করেছে। স্বল্পমূল্যে থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে।

৩. দেবী জয়দুর্গা (বক্রেশ্বর)

পীঠ নির্ণয় মন্ত্রের ষটচত্বারিংশ শৎ শক্তিপীঠ হল বক্রেশ্বর—

"বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদীপাপহারা তত্র দেবী মহিষমর্দিনী।।"

আবার উক্ত গ্রন্থেই সপ্তম পীঠস্থান হিসাবে বৈদ্যনাথ ধামের কথা আছে। এবং এখানে দেবীর হৃদয় পতনের উল্লেখ রয়েছে—

"হার্দ্যপীঠং বৈদ্যনা বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবণ
দেবতা জয়দুর্গাস্যা...।।"

হৃদয় ও মন একই। ' হের্বজ্রতন্ত্র', 'কালিকাপুরাণ', 'রুদ্রযামল', 'কুলা নবতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদ্যনাথ পীঠের কথা আছে। অপরদিকে পীঠ নির্ণয়ের মূল পুঁথিতে বক্রেশ্বরের নাম নেই। এই সমস্যার সমাধান করেছেন শিবচরিত। সেখানে বলা হয়েছে বক্রেশ্বরে দেবীর দক্ষিণ বাহু পতিত হয়েছে। ভৈরব বক্রেশ্বর তবে দেবীর নাম বক্রেশ্বরী। তবে মন্দিরের পুরোহিতরা বলে থাকেন এই পীঠস্থানে সতীর ভ্রুসন্ধি পতিত হয়েছিল, দেবী জয়দুর্গা। বক্রনাথ ভৈরব মন্দিরের পাশেই দেবীর মন্দির। মন্দিরের বেদীত একটি প্রাচীন কালো পাথর রক্ষিত আছে যা পতিত সতী অঙ্গ ভ্রসন্ধির প্রস্তরীভূত শিলা রূপে মান্যতা প্রাপ্ত। দেবীর অষ্টধাতু/পিতলের দশভূজা মূর্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বলে পণ্ডিতদের অভিমত। মন্দিরের উত্তরে পাপহারা নদী ও মন্দির চত্বরে কুণ্ড অবস্থিত।

পুরাণ কথানুসারে বক্রেশ্বরকে গুপ্তকাশী বলা হয়। দেবী লক্ষ্মীর স্বয়ংবর সভায় মর্ত্যধামের দুই ঋষি আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র লোমশ মুনিকে পাদ্যার্ঘ দিয়ে অভ্যর্থনা করলেও অপর মুনি সুব্রতকে আপ্যায়ন না করায় তিনি অপমানে ক্রুদ্ধ হন এবং ক্রোধ দমন করতে গিয়ে তাঁর অষ্টাঙ্গ বেঁকে যায়, সেই থেকে তিনি অষ্টবক্রমুনি নামে পরিচিত হন। লোমশ মুনির প্রতি তিনি হিংসা করেছিলেন বলে কাশীতে পাপ স্খালনের জন্য তপস্যা শুরু করেন এবং বিশ্বনাথের নির্দেশে বক্রেশ্বরে এসে সিদ্ধকাম হন। মহাদেব দর্শন দিয়ে বলেন -আজ থেকে এই স্থান সিদ্ধপীঠ। এখানে তোমার পূজার পর আমার পূজা হবে। বক্রেশ্বরে আটটি প্রসিদ্ধ কুণ্ড রয়েছে। ভৈরবকুণ্ড, ক্ষারকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, জীবিতকুণ্ড, ব্রহ্মাকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা ও বৈতরণী। প্রতিটি কুণ্ডের সঙ্গেই পৌরাণিক কাহিনির

যোগ আছে। অগ্নিকুণ্ডটি উষ্ণপ্রস্রবণ। এর উষ্ণতা ৮০° সেন্টিগ্রেড। এর পাশেই জীবিতকুণ্ডের জল আশ্চর্যজনকভাবে শীতল। পাণ্ডাদের গৃহে অবস্থিত দেবীর অষ্টাদশভূজা প্রাচীন বিগ্রহটি দর্শনীয়। শিবরাত্রির সময় দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার অধীনস্থ বক্রেশ্বর কলকাতা থেকে ২৩০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। পূর্ব রেলের সাঁইথিয়া হয়ে বক্রেশ্বর পর্যন্ত ট্রেন যোগে যাওয়া যায়। সিউড়ি হয়ে বাসেও যাওয়া যেতে পারে। বক্রেশ্বরে রাত্রিবাসের একাধিক লজ রয়েছে।

৪. দেবী নন্দিনী (নন্দীপুর/সাঁইথিয়া)

পীঠ নির্ণয় তন্ত্রের ঊনপঞ্চাশৎ পীঠ নন্দিপুর—

"হার পাতো নন্দিপুরে ভৈরব নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধি ভবাপ্পুরাত্।।"

বীরভূমের আজকের সাঁইথিয়া ছিল সেদিনের নন্দীপুর। এখানেই পতিত হয়েছিল দেবীর গলার হাড়। যদিও পীঠমালা তন্ত্র মতে এখানে সতীর গলার হাড় পতনের সংবাদ আছে—

"হাড় পাতো নন্দিপুরে ভৈরবো নন্দীকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্নসংশয়।।"

মন্দিরের পূজারি ও স্থানীয়দের দাবি এখানে দেবীর গলার হাড় পতিত হয়েছিল। শিবচরিত গ্রন্থে বলা হয়েছে দেবীর কণ্ঠহাড় পতিত হয়েছে অযোধ্যায় আর ওই হারের অংশবিশেষ পড়েছিল নন্দীপুরে। উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী। তার কোলে শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে দেবী নন্দিনীর পীঠস্থান। সুবিশাল প্রাচীন বট, অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় দেবীর মন্দির। মন্দিরের মধ্যে বেদিতে একটি বিশালাকার আকৃতিবিহীন প্রস্তরখণ্ড তেল সিন্দুরে চর্চিত হয়ে লাল টকটকে। তার উপর রূপার চোখ, নাক, মুখ বসিয়ে দেবীর মূর্তি। বটবৃক্ষতলের কোটরে ভৈরব নন্দীকেশ্বর রূপে পূজা পান। মন্দিরের পেছনেই রয়েছে কুণ্ডপুকুর। অনেকবারই সাঁইথিয়া শহর বন্যায় ভেসে গেছে কিন্তু কখনও মায়ের মন্দির চত্বরে বন্যার জল স্পর্শ করেনি। অর্থাৎ স্থানটি চারপাশের তুলনায় উচ্চ। তন্ত্রমতে পীঠ হওয়ার জন্য ভূমিভাগকে কূর্মাকৃতি, উত্তরে নদী, কুণ্ড থাকা প্রয়োজনীয়। এর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নন্দিপুরে রয়েছে। মা নন্দিনীকে চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্ভুজা দুর্গার ধ্যানে পূজা করা হয়। বিপদতারিণী পূজার সময় বেশ ভক্তসমাগম হয়। তবে দেবীর বার্ষিক পূজা পৌষে হয়। কলা, বাতাসা দিয়ে দেবীকে পূজা নিবেদনের রীতি প্রচলিত। প্রত্যহ খিচুড়িভোগ উৎসর্গ করা হয়। ভোগে মাছ দেওয়া হয়। এই মন্দিরে কোনও পাণ্ডা নেই। নন্দিনী পীঠের শান্ত ধ্যানগম্ভীর পবিত্র পরিবেশ আজও কলুষিত হয়নি।

জনশ্রুতি আছে উমা নামে এক বাল্যবিধবা প্রতিদিন ময়ূরাক্ষী পেরিয়ে দেবীর পূজা করতে আসতেন। তখন অবশ্য মন্দির তৈরি হয়নি। দেবীর মন্দিরটি নির্মাণ করেন সাঁইথিয়ার

জমিদার পঞ্চানন ঘোষের পূর্বপুরুষ দেওয়ান দাতারাম ঘোষ। তিনি একদা যাত্রাকালে পথিমধ্যে উক্ত বটবৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করছিলেন, ক্লান্তিতে নিদ্রাচ্ছন্ন হন। তখন দেবী স্বপ্নে জানান—'আমি নন্দিকেশ্বরী, এই বটবৃক্ষ মূলে অবস্থান করছি, তুই আমার পূজার ব্যবস্থা কর।' দেবীর কৃপায় দাতারাম প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন ও মায়ের মন্দির নির্মাণ করেন। তারাপীঠের সাধক বামাখ্যাপাও এসেছেন মা নন্দিনীর দরবারে।

শিয়ালদহ/হাওড়া স্টেশন থেকে রামপুরহাটগামী যে কোনও ট্রেনে আসুন সাঁইথিয়া জংশন। স্টেশনে নেমে হাঁটা পথে তিন মিনিট গেলেই পাবেন পাঁচিল ঘেরা বটবৃক্ষমূলে অবস্থিত নন্দীপুর পীঠ। রাত্রিবাসের জন্য হোটেল ও লজ আছে।

৫. দেবী কঙ্কালী (কঙ্কালীতলা)

বিশ্বকবির রবীন্দ্রনাথের দৌলতে বোলপুর আজ মিলনতীর্থ। আজকের বোলপুরের প্রাচীন নাম ছিল বলিপুর। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে এই স্থানেই রাজা সুরথ দেবী চণ্ডীর কৃপালাভের জন্য এক লক্ষ বলিদান করেছিলেন। সে যাই হোক। বোলপুরে কোপাই তীরে রয়েছে প্রসিদ্ধা সিদ্ধপীঠ কংকালীতলা। বোলপুর স্টেশন থেকে কংকালীতলা সড়কপথে মাত্র ৮ কি.মি.। বোলপুর থেকে লাভপুরগামী বাসে করে কংকালীতলা যাওয়া যায়। বাস থেকে নামলেই সুদৃশ্য তোরণ পথ। রাত্রিবাসের ব্যবস্থা নেই, রাত্রিবাস করতে হলে বোলপুর। এবার আমরা কংকালীতলার পথে।

পীঠনির্ণয়তন্ত্রের অষ্টবিংশতি ও শিবচরিতের সপ্তত্রিংশৎ সতীপীঠকাঞ্চী দেশ—

"কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো বৈরবো রুরু নামকঃ।
দেবতা দেবগর্ভাখ্যা।।"

কাঞ্চী শব্দটি শ্রবণ মাত্রই আমাদের কাঞ্চীপুরমের কথা মনে হয়। কাগজে কলমে কাঞ্চী দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের রাজধানী। কিন্তু ইতিহাসের কাঞ্চীর সঙ্গে সতীপীঠ কাঞ্চীর কোনও মিল নেই। সাধক গৌতম ভারতী বলেছেন—কাঞ্চীপুরমে সতীপীঠের চিহ্নমাত্র নেই। আবার গবেষক দীনেশচন্দ্র সরকার কাঞ্চীপুরমের কামাক্ষী ও একাম্রনাথ মন্দিরকে পীঠের স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী। তবে সতীপীঠ হিসাবে কংকালীতলাই প্রসিদ্ধ। ইতিহাস থেকে জানা যায় বীরভূমের এই অঞ্চল পালযুগে কাঞ্চীরাজ রাজেন্দ্র চোলের সেনাশিবির স্থাপিত হয়েছিল (তিরুমালয় লিপি ১০২৫ খ্রি.)। সেই সময় এই স্থানে একটি শিবমন্দিরও স্থাপিত হয়েছিল। যা আজও কাঞ্চীশ্বর নামে পরিচিত। এছাড়াও বহু দক্ষিণ দেশাগত ব্রাহ্মণ এই অঞ্চলে বসবাস করেন। সেই সূত্রে কংকালীতলার পূর্বনাম কাঞ্চী দেশ হওয়া অবাস্তব বা অসম্ভব নয়।

কংকালীতলার অবস্থানের পাশাপাশি দেবীর অস্তিত্ব নিয়েও অনেকে সন্দিহান। তাঁদের মত হল দেবীদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গেলে কঙ্কাল আসবে কোথা থেকে? তাই তাঁরা ভারতচন্দ্রের অভিমতকে স্বীকার করেন—

"কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকলি অভিরাম।
বেদগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম।।"

কাঁকলি শব্দের অর্থ কাঁখ বা কোমর। মন্দিরের কুণ্ডপাড়ের বোর্ডে কাঁকলি বা কাঁখ পতনের কথা লেখা রয়েছে। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত পীঠনির্ণয় অনুসারী। কংকালীতলার কুণ্ড পুকুরেই পড়েছিল সতীর কংকাল বা পাঁজরা। যা আজ শিলারূপে কুণ্ডতে নিমজ্জিত আছে। সে শিলামূর্তির দর্শন সবসময় হয় না। প্রতি বারো বছর অন্তর কুণ্ডের পাঁক পরিষ্কার হয়ে থাকে। একমাত্র সে সময়েই শিলামূর্তিকে দর্শন করা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সে শিলা মূর্তি অবিকল মানুষের বক্ষপঞ্জরের ন্যায়। রূপার মতো উজ্জ্বল এবং সিন্দুরের মতো রক্তিম আভাবিশিষ্ট। কুণ্ডের জলেই নিমজ্জিত থাকেন পঞ্চশিব। চৈত্রসংক্রান্তির দিন পঞ্চশিবকে তুলে কাঞ্চীশ্বর শিবের মন্দিরে স্থাপন করা হয়। পূজার পর পুনরায় ১ বৈশাখ দেবতাদেরকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির দিন দেবীর উদ্দেশ্যে কুণ্ডে পূজা নিবেদিত হয়। সারা বছর কুণ্ডপাড়ের মন্দিরের পূজা হয়। এই কুণ্ড মহাপবিত্র। এর জল কখনও শুকায় না। এই কুণ্ডে নামা বা এর জলে পা লাগানো নিষেধ। কুণ্ডের জল ভক্তরা মস্তকে ধারণ করেন ও পান করে থাকেন।

কংকালীতলার উত্তরে কোপাই নদী। কোপাই তীরে মহাশ্মশান ও পঞ্চবটী বন। তার মাঝেই দেবীর কুণ্ড। কুণ্ডেই দেবী অবস্থান। পূর্বে এখানে কোনও মন্দিরে ছিল না। পরে অধুনা এক নবনির্মিত মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের বেদিতে ১০৮ নরমুণ্ড প্রথিত আছে। বেদির উপর বিগ্রহ নেই। একটি দক্ষিণাকালীর বাঁধানো ফটো রাখা আছে। আর আছে দেবী দেবগর্ভার উদ্দেশ্যে স্থাপিত ঘট। এই ঘট ও পটেই দেবীর নিত্যসেবা চলে। দেবীর চিত্রটি শান্তিনিকেতনের চিত্রকর মুকুল দে-র অঙ্কিত। দেবী এখানে করালবদনা নন, শান্তিময়ী কোমল বদনা। দেবী দেবগর্ভা হলেও সাধারণ্যে তিনি মা কংকালী নামেই পরিচিতা।

মন্দিরের প্রবেশপথের বামদিকে কাঞ্চীশ্বর শিব ও তার পাশে দেবীর ভৈরব রুরুর মন্দির। দুটি শিবেরই গৌরপট্টটুকু আছে। যা বিস্ময়ের এবং গবেষণার। আরও উল্লেখ্য রুরু ভৈরবের মন্দিরে ভক্তরা মাটির ঘোড়া নিবেদন করেন এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে ছাগ বলিদান ও দেন। ওইটিও বেশ ব্যতিক্রমী। দুর্গাপূজার পর শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই সতীপীঠে ৫১ কুমারীকে নিয়ে গনকুমারীর পূজা হয়।

গবেষক প্রণবেশ চক্রবর্তী বর্ধমানের কাঞ্চন নগরকে কাঞ্চীদেশ বলার পক্ষপাতী। দামোদরের তীরে অবস্থিত কাঞ্চননগরে কঙ্কালেশ্বরী মন্দির রয়েছে। উক্ত দেবীর বিগ্রহে শিরা, উপশিরা, ধমনী, স্নায়ু খোদিত আছে। পরিব্রাজক বিরাজনন্দ গিরি দামোদরে স্নান করতে গিয়ে বিগ্রহটি পান। এই বিগ্রহ সম্পর্কে ও গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন।

৬. দেবী ফুল্লরা (লাভপুর ও অট্টহাস)

কংকালীতলা থেকে ৩৬ কি.মি. দূরে লাভপুর। বোলপুর থেকে ৪৪ কি.মি.। সড়কপথে বাসে করে যাওয়া সবচেয়ে সুবিধাজনক। ট্রেনেও যাওয়া যেতে পারে। বর্ধমান রামপুরহাট

লাইনে আহমেদপুর জংশন। এখান থেকে কাটোয়াগামী ট্রেনে লাভপুর স্টেশন যাওয়া যায়। লাভপুর থেকে মন্দির ২ কি.মি., পিচরাস্তা। সাহিত্যিক তারাশঙ্করের জন্মভূমি এই লাভপুর। এখানেই রয়েছে ফুল্লরা পীঠ।

পীঠনির্ণয় মতে অষ্টচত্বারিশৎ পীঠ হল ফুল্লরাপীঠ—

"অট্টহাসেচোষ্ঠ পাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্বাভিষ্ট প্রদায়কঃ।।"

শিবচরিত গ্রন্থে ভৈরব পর্বতে সতীর ওষ্ঠ পতনের কথা আছে। দেবী সেখানে অবন্তী ও ভৈরব নম্রকর্ণ। উক্তগ্রন্থে অট্টহাসকে উপপীঠ ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে এখানে দেবীর ওষ্ঠের অংশ বিশেষ পতিত হয়েছে। যদিও দেবী ও ভৈরব-এর নাম অপরিবর্তিত। লাভপুরে দেবীর নাম ফুল্লরা ও বিশ্বেশ্বর ভৈরব মন্দির আছে। তবে স্থানটি অট্টহাস নামে পরিচিত নয়। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে অট্টহাস তীর্থ আছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। এখন দেখা যাক ফুল্লরাপীঠে কী রয়েছে?

লাভপুরে ৬৬ বিঘা জমির উপর ফুল্লরা পীঠ। তিনদিকে শ্মশান। পাশেই কুণ্ড যা দেবীদহ নামে পরিচিত। জনশ্রুতি শ্রীরামের অকাল বোধনের পদ্ম হনুমান এখান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। জনশ্রুতিটি নিতান্তই ভিত্তিহীন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে দেবীদহে আজও প্রচুর পদ্ম ফোটে যা দেবীর নিত্যপূজায় ব্যবহৃত হয়। মন্দিরে দেবীর কোনও বিগ্রহ নেই। ওষ্ঠ আকৃতির বিস্তৃত শিলা সিন্দুরচর্চিত। পুরোহিত বলেন এটিই দেবীর ওষ্ঠ যা শিলাতে পরিণত। দেবী ফুল্লরাকে জয়দুর্গার ধ্যান মন্ত্রে পূজা করা হয়। মাঘী পূর্ণিমাতে দেবীর বার্ষিক পূজা। মন্দিরের সামনে বলিদানের স্তম্ভযূপ। বলিস্থানের মাটি শ্বেতী ও চর্মরোগের নিরাময় করে বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। মন্দির চত্বরেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন। এখানে প্রত্যহ শিবাভোগ দেওয়া হয়। দেবীকে অন্নভোগ নিবেদনের পর ঝাঁঝ ঘড়ি বাজালেই সর্বসমক্ষে শেয়ালরা আসে প্রসাদ গ্রহণ করতে। দেবীর অন্নভোগে মাছের টক আবশ্যক। ফুল্লরাপীঠকেই অট্টহাসপীঠ বলেছেন গবেষক ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।

অনেকে মনে করেন অট্টহাস হল বর্ধমানের কেতুগ্রামে। বোলপুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে উদ্ধরণপুরগামী বাসে নিরল স্টপেজ। ওখান থেকে মোরাম রাস্তায় রিক্সায় করে আধ ঘণ্টা গেলে অট্টহাস। যদিও গ্রামের নাম দক্ষিণডিহি। হঠাৎ করে দক্ষিণ ডিহি কী করে অট্টহাস হল সে বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। সে যাই হোক, অট্টহাস ভারী সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বলিত। গাছে গাছে বাদুড় আর পরিযায়ী পাখিদের ভিড়। জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে উঠবে। উত্তর দিয়ে বয়ে চলেছে ঈশান নন্দী। আছে শ্মশান, পঞ্চমুণ্ডী এবং স্থানটি কাছিমের পৃষ্ঠের ন্যায়। প্রাচীন কুব্জিকাতন্ত্রে অট্টহাসের কথা আছে—

"অট্টহাসে মহানন্দো মহানন্দা মাহেশ্বরী।"

আবার উভগ্রন্থেরই সপ্তম পটলে আছে—

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাক যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অট্টহাস থেকে চামুণ্ডা মূর্তি উদ্ধার করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তা প্রদান করেন। অর্থাৎ অন্যতন্ত্র গ্রন্থে অট্টহাসের পীঠ দেবী হিসাবে চামুণ্ডা/মহানন্দার নাম আছে। যদিও স্থানীয়রা দেবীকে অধরেশ্বরী ও ভৈরবকে বিশ্বেশ্বর নামে চেনেন। মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই। যন্ত্রে ও ঘটে দেবীর পূজা হয়। মন্দিরের সম্মুখে প্রতীক ভৈরব চন্দ্রশেখর-এর মন্দির। দেবীর ভৈরব রয়েছেন কাটোয়ার কাছে বিশ্বেশ্বর গ্রামে। দেবীর বার্ষিকপূজা হয় দোল পূর্ণিমার। নিরামিষ ভোগ নিবেদিত হয়। কেউ মানসিক করলে বলিদান হয় তবে তা দেবীকে উৎসর্গ করা হয় না।

এখন প্রশ্ন অট্টহাস (কেতুগ্রাম) ও ফুল্লরাপীঠ (লাভপুর)-এর মধ্যে কোনওটির কথা আছে শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে। সতীপীঠরূপে অট্টহাসের উল্লেখ বেশ প্রাচীন। তবে নামটিই যথেষ্ট নয়। কারণ তন্ত্রগ্রন্থাদিতে পীঠস্থানের নাম থাকলেও তার স্থান জ্ঞাপক কোনও বর্ণনা নেই। পীঠের স্থাননাম বর্ণনাতে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে মতপার্থক্য আরও বিভ্রান্তি বৃদ্ধি করেছে। তাই স্থাননাম থাকলেই তা সতীপীঠ বলে উল্লসিত হওযার যেমন কারণ নেই তেমনি নাম না থাকলে নিরাশ হওয়ারও কিছু নেই। এখন দুটি স্থানের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে—১. লাভপুরে উত্তরবাহিনী কোপাই রয়েছে, অট্টহাসে রয়েছে উত্তর বাহিনী ঈশানী। ২. দুটি স্থানেই রয়েছে শ্মশান ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন। ৩. দুই জায়গাতেই শিবাভোগের ব্যবস্থা আছে। ৪. অট্টাহাসে সিদ্ধিলাভ করেন সাধক শিবানন্দ, ফুল্লরাপীঠে সিদ্ধহন কৃষ্ণানন্দ গিরি। ৫. ড. দীনেশচন্দ্র সরকার ফুল্লরাপীঠের সমর্থক, অপরদিকে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নগেন্দ্রনাথ বসু অট্টহাসের সমর্থক। বালানন্দ ব্রহ্মচারী অবশ্য ফুল্লরাপীঠকে অট্টহাস বলে মত দিয়েছেন। তিনি একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন—পুরাণে আছে মহামুনি বশিষ্ঠের তিন পুত্র—মহাদেব, ভবদেব ও অট্টহাস। এই অট্টহাস মুনি ফুল্লরা পীঠে সিদ্ধিলাভ করেন বলেই ওইটি অট্টহাস নামে পরিচিত। আর কেতুগ্রামে দেবী ফুল্লরা নন, অধরেশ্বরী। ভৈরবকে নিয়েও সমস্যা রয়েছে। আবার কেতুগ্রামে যে লেখমালা পাওয়া গেছে তাতে দেবী বহুলার নাম উল্লিখিত হয়েছে। বহুলা সতীপীঠ কেতুগ্রামে অবস্থিত। সে স্থানের লিপি এখানে এল কী করে? আমাদের মনে হয় বর্গি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দেবী বহুলার কিছু অংশ দুর্ভেদ্য এই জঙ্গলে স্থাপিত হয়েছিল। স্থানটি তন্ত্রপীঠ হওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং জনবিচ্ছিন্ন ছিল বলেই নির্বাচিত হয়েছিল। তবে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস লাভপুরে দেবীর ওষ্ঠ এবং অষ্টহাস কেতুগ্রামে দেবীর অধর পতিত হয়েছিল। যদিও তা শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

৭. দেবী বহুলা (কেতুগ্রাম)

পীঠ নির্ণয় তন্ত্রের মতে দ্বাদশ পীঠ হলে বহুলা। এই পীঠ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে—

"বহুলায়াং বামবাহুর্ববহুলাখ্যা চ দেবতা
ভীরুক ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ।।"

বর্ধমানের কেতুগ্রামই প্রাচীন কালের বহুলা। পরবর্তীকালে চন্দ্রকেতু নামে একজন

ভূস্বামী এখানকার রাজা হন। তাঁর নাম অনুসারেই পরে জায়গাটির নামকরণ করা হয় **কেতুগ্রাম**। অনেকের মতে কেতুগ্রাম পূর্বে কেতুগড় ছিল পরে কেতুগ্রাম নামে পরিচিত **হয়**। **মন্দিরে** দেবী বহুলার প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। উচ্চতা সাড়ে তিন হাত। দেবী চতুর্ভুর্জা। **দেবীর** হস্তে দর্পণ, চিরুণি এবং বর ও অভয় মুদ্রা। অবশ্য দেবীর একটি হাত ভাঙা। দেবীর **মাথায়** মুকুট। পশ্চাতে ত্রিকোণাকার চালচিত্র। বিগ্রহটি বৌদ্ধযুগের। দেবীমূর্তির কাপড় পরানোর ধরণটি অভিনব। গলার দুধার দিয়ে শাড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে দেবীর **মুখমণ্ডল** ছাড়া সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত। ভাঙা হাতটি ঢাকা দিতেই কি এই অভিনব কৌশল? কেউ কেউ বলেন মূর্তিটি ভাঙা, অনভিজ্ঞ কারিগরকে দিয়ে মূর্তিটি মেরামত করা হয়েছে। নাকি কিছু গোপন করার চেষ্টাও আছে? দেবী মূর্তির পাশেই আছে অষ্টভূজ সিদ্ধিদাতা গণেশ। এইরকম গণেশ সারা রাজ্যে মাত্র তিনটি রয়েছে। দেবীর বার্ষিক পূজা মহানবমীতে অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় দেবীর কাছে ছাগ ও মহিষ বলিদান করা হয়। মহিষটির কান কেটে রেখে দেওয়া হয় এবং তা থেকে দৈব ঔষধ প্রস্তুত হয়। অম্বলশূল ও সূতিকা রোগ নিরাময়ের জন্য দেবীর স্বপ্নপ্রদত্ত দৈব ঔষধ দেওয়া হয়ে থাকে। দেবীকে—

> "ধ্যায়েদ্ভ্রী বহুলা নগন্দ্রে তনয়া পদ্মাসনস্থাং শুভম্।
> দোভিঃ কক্ষতিকাং বরাভয়যুক্তাং বামে স্বপুত্রান্বিতাম্।।
> গৌরাঙ্গীং মনিহারকণ্ঠ নমিতাং চিন্ত্যাং মুখাং কামদাম্।।"

মন্ত্রে পূজা করা হয়। মন্দিরের কাছে কোনও ভৈরবের মন্দির নেই। কারও মতে ভৈরব আছেন পাশের গ্রাম শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের শিব মন্দিরটি ভূতনাথ মন্দির নামে পরিচিত। যদিও প্রাণতোষণী তন্ত্রে ভূতনাথ ভৈরবকেই ভীরুক বলা হয়েছে—

> "নমস্তে ভীরুকায় ভূতনাথ নাম ধারিণে।
> বহুলাক্ষী ভৈরবায় সদা শ্রীখণ্ডবাসিনে।।"

ভূতনাথ ভৈরব অনাদিলিঙ্গ। শিবলিঙ্গটি অদ্ভুত দর্শন। লিঙ্গগাত্রে বহুলার প্রতীক স্বরূপ একটি গোলাকার মুখ সংযোজিত। কোনও গৌরীপট্ট নেই। মন্দিরের উত্তরদিকের কুলুঙ্গিতে দুগ্ধকুমার নামে একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে যা ভূতনাথের প্রতিনিধি। ঐতিহাসিক হিতেশরঞ্জন সান্যাল ভূতনাথ ভৈরবকে কোনও প্রাচীন সৌধের ধ্বংসাবশেষ বলে মন্তব্য করেছেন। দেবী বহুলার মন্দিরটি লালগোলার মহারাজ নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৬৭ তে বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়েছে। বহুলা দেবীর মন্দির সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্যটিও স্মরণীয়—"দেবী ও তাঁহার বর্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।"

৮. দেবী বহুলাক্ষী (রণখণ্ড/কেতুগ্রাম)

কেতুগ্রামকে যুগ্মপীঠ বলা হয়। দেবী বহুলা পীঠের কথা তো বলা হল। এই গ্রামেরই শেষ প্রান্তে ঈশানী নদীর তীরে নির্জন জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে দেবী বহুলাক্ষীর মন্দির। শিবচরিতে

স্থানটির নাম রণখণ্ড। এই স্থানে পতিত হয়েছিল সতীর ডান কুনুই। দেবীর নাম বহুলাক্ষী এবং ভৈরব মহাকাল। শিবচরিতে স্থানটির নাম রণখণ্ড হলেও স্থানীয়রা একে মরাঘাট মহাতীর্থ রূপে চেনেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে কেতুগ্রামে বহুলা ও বহুলাক্ষী এই দুই পীঠ দেবীর অবস্থানের জন্য যুগ্মপীঠ বলা হয়। রণখণ্ডের এই মন্দিরে দেবীর কোনও বিগ্রহ নেই। ঘটে দেবীর পূজা হয়। তবে এই পীঠে স্বমহিমায় বিরাজিত আছেন পীঠ ভৈরব মহাকাল। দেবীর ধ্যান মন্ত্রটি হল—

"ওঁ ধ্যায়েদ্ত্রী বহুলাং তনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভম্।
দোভি কঙ্কতিকাং বরাভয়যুক্তাং দার্শনিত্বাম শোভিতং নিদ্রাবেশ।।
বসান চিত্বাং ত্রিনয়ণাং বাগযুক্ত পুত্রান্বিতাং গৌরাঙ্গীং।
মনিহার কণ্ঠ নমিতাং চিন্ত্যাং সুখং কামোদং।।
ওঁ হ্রীং বহুলাক্ষী ভগবৎ দুর্গায়ৈ নমঃ।।"

লক্ষণীয় দেবী বহুলা ও দেবী বহুলাক্ষীর ধ্যান মন্ত্র অনেকাংশে একই রকম। প্রাণতোষণী তন্ত্রে ভৈরব ভীরুককে বহুলাক্ষীর ভৈরব রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও তিনি বহুলার ভৈরব রূপে পরিচিত। শিবচরিত মতে বহুলাক্ষীর ভৈরব মহাকাল। তাহলে কি পীঠনির্ণয়ের বহুলা আর শিবচরিতের বহুলাক্ষী মূলে একই দেবী?

উত্তরবাহিনী ঈশানীর তীর জঙ্গলবেষ্টিত টিলাইটিই মরাঘাট বা তন্ত্রের রণখণ্ড। অনেকে বলেন গ্রীষ্মে নদীতে এক ফোঁটাও জল থাকে না তাই মরাঘাট। আবার কারও মতে এই স্থানে ছিল শ্মশান তাই মরাঘাট। তবে যে কারণেই মরাঘাট নাম হোক না কেন স্থানটির তান্ত্রিক পরিসর লক্ষণীয়। ব্রহ্মখণ্ডে কথিত হয়েছে বকুলা ও বহুলা নদীর তীরে অবস্থিত রণখণ্ড। মরাঘাটের ঘাটটি পুরাণের বকুলা নদীর মজা খাল বিশেষ। ঈশানীকেই বহুলা বলা হয়েছে। এখানে পূর্বে শিবা ভোগ হত। অট্টহাসতীর্থে যে ফলক রক্ষিত আছে তাতে দেবী বহুলাক্ষীর নাম আছে। বর্তমান মন্দিরে দেবীর কোনও বিগ্রহ নেই। এর ভিত্তিতে আমাদের অনুমান দেবী বহুলার আদিপীঠ স্থান ছিল বর্তমান বহুলাক্ষীর পীঠে। কোনও কারণে দেবীকে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল থেকে উদ্ধার করে গ্রামের মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয়। কিন্তু স্থানটিতে দেবীর আবির্ভাব হেতু তা মানুষজনের কাছে শ্রদ্ধার ছিল। পরবর্তীতে দেবীবিহীন অথচ পুণ্যক্ষেত্রটিকে স্বতন্ত্র দেবী বহুলাক্ষীর পীঠরূপে কল্পনা ও প্রচার করা হয়। কিন্তু আদিতে যেহেতু দুই দেবীই অভিন্না ছিলেন তাই উভয়ের ক্ষীণ যোগসূত্রকে আজও ছিন্ন করা যায়নি। মরাঘাটের দেবীর বার্ষিক পূজা শিবরাত্রির সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

কেতুগ্রাম বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অবস্থিত। কাটোয়া থেকে কেতুগ্রামের দূরত্ব সড়ক পথে ১৫ কি.মি.। কেতুগ্রাম বাসস্ট্যান্ড থেকে হেঁটে বা রিক্সার করে দেবী বহুলা ও বহুলাক্ষীর মন্দিরে যাওয়া যায়। কেতুগ্রামে ভক্তদের জন্য যাত্রী নিবাস আছে। বহুলাক্ষীর মন্দির গ্রামের শেষ প্রান্তে। ঈশানীর উপর বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যেতে হবে।

৯. দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা (উজানি/কোগ্রাম)

পাঠনির্ণয় তন্ত্র মতে ত্রয়োদশ সতীপীঠ উজ্জয়িনী—

"উজ্জয়িন্যাং কুর্পরশ্চ মাঙ্গল্য কপিলাম্বর।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।।"

এ উজ্জয়িনী মেঘদূতের বা বাস্তবের উজ্জয়িনী নয়, 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকের **উজ্জয়িনীপুর**' ও নয় এ উজ্জয়িনী বর্ধমানের মঙ্গলকোটের উজানী। চণ্ডীমণ্ডল কাব্যের নায়ক ধনপতি ও শ্রীকান্তের রাজধানী। অনেকে বলেন তান্ত্রিক মঙ্গলকোষ্ঠের বসবাস হেতু এই অঞ্চলের মঙ্গলকোট নামকরণ হয়েছে।

কিন্তু এ তথ্য ঐতিহাসিক নয়। বিনয় ঘোষের মন্তব্য স্মরণীয়—'মোঙ্গলকোষ্ঠ নামে বিখ্যাত তান্ত্রিক কেন্দ্র ছিল ওড্ডিয়ানের উত্তর-পশ্চিমে। কুব্জিকা তন্ত্রে মঙ্গলকোটকে মহাপীঠ বলা হয়েছে। ইসলামধর্মের আগমনে উড্ডিয়ানে তান্ত্রিক প্রভাব যখন প্রায় স্থিমিত ঠিক তখনই পালযুগে বাংলাতে তন্ত্রের প্রাধান্য চলছিল। সম্ভবত তখনই বৌদ্ধতান্ত্রিকর উত্তর-পশ্চিমের মঙ্গলকোষ্ঠ ও উড্ডীয়ানের অনুকরণে বর্ধমানের এই স্থানে দুটির মঙ্গলকোট ও উজানী নামকরণ করেন। সেই মঙ্গলকোটের দেবী বলেই চণ্ডীর নাম হয় মঙ্গলচণ্ডিকা।' চণ্ডীমঙ্গলের রাণী খুল্লনার পূজিত দেবীও এই মঙ্গলচণ্ডিকা। আমাদের অনুমান প্রথমে তান্ত্রিক ও পরে মঙ্গলকাব্যে এই দুইক্ষেত্রেই দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা স্থানীয়ভাবে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন, এই জনপ্রিয়তা সূত্রে তিনি পরবর্তীতে তিনি পীঠদেবীতে পরিণত হন।

দক্ষিণমুখী কারুকার্যহীন একটি নবীন মন্দিরে দেবীর অবস্থান। মন্দিরের উত্তরে অজয় প্রবাহিত। মন্দিরের পিছনে সিঁড়ি নেমে গেছে অজয়ের বুকে। পূর্বে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকার অষ্টধাতুর বিগ্রহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে মূর্তি চুরি যাওয়ার পর পিতলের দশভূজা মূর্তি স্থাপিত হয়। ১৯৪০-এর পর সে মূর্তিও চুরি যায়। তারপর ১৯৯৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পৌত্র সুবোধ মল্লিকের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে প্রস্তরনির্মিত দশভূজা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরে আদি বিগ্রহের একটি চিত্র আছে। সিংহাসনের বামপার্শ্বে লিঙ্গমূর্তিরূপী ভৈরব কপিলেশ্বর মতান্তরে কপিলাম্বর। তার পাশেই বজ্রাসনে উপবিষ্ট বৌদ্ধমূর্তি পূজা পান। এটি ১ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতা, প্রস্থে ১১ ইঞ্চি। অর্থাৎ উজানীর বৌদ্ধ প্রভাবকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। সেদিক থেকে উজানীর পীঠস্থান হিন্দু বৌদ্ধ ও শাক্তধর্মের এক ত্রিবেণীসঙ্গম।

ইতিহাসের উজ্জয়িনী মালবের রাজধানী। বর্তমানে অবশ্য তার নাম উজ্জইন। মহাভারতের সময়ে এই উজ্জয়িনীরই নাম ছিল অবন্তী। পীঠনির্ণয় তন্ত্রে অবন্তীরও নাম আছে। তবে সেখানে সতীর ঊর্ধ ওষ্ঠ পতনের সংবাদ আছে—

"ঊর্ধ্বৌষ্ঠো ভৈরব পর্বতে
অবন্ত্যাঞ্চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ।।"

অর্থাৎ অবন্তীতে বা উজ্জয়িনীতে দেবীর ঊর্ধ ওষ্ঠ পতিত হয়েছিল, দেবীর নাম মহাদেবী ও ভৈরব লম্বকর্ণ। পীঠনির্ণয় মতে এটি ঊনচত্বারিশৎ শক্তিপীঠ। আর বঙ্গের উজ্জয়িনী উক্তগ্রন্থ মতে ত্রয়োদশ সতীপীঠ। অর্থাৎ যুক্তির দিক থেকে বঙ্গের পীঠটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তা যতই আধুনিক হোক না কেন।

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত কোগ্রামই সতীপীঠ উজানী। সাহিত্যিক কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের জন্ম স্থান এই কোগ্রাম। গুমকরা স্টেশন থেকে বাসে কোগ্রাম যাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে ভালো বোলপুর থেকে পালিত পুরগামী বাসে পালিতপুর। ওখান থেকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় নবনির্মিত রাস্তায় রিক্সায় করে মন্দির যাওয়া যায়। কিছুটা রাস্তা মোরামের। তবে পথনির্দেশ সম্বলিত বোর্ড আপনার সহায় হবে।

১০. দেবী তারা (তারাপীঠ)

শিবচরিতগ্রন্থ ছাড়া আর কোন পীঠ সম্পর্কিত গ্রন্থেই তারাপীঠের উল্লেখ নেই। অথচ পশ্চিমবঙ্গে যত শক্তিপীঠ রয়েছে তার মধ্যে তারাপীঠ প্রথম সারিতে রয়েছে। জনপ্রিয়তার নিরিখে তারাপীঠ একেবারে শীর্ষে। শিবচরিত মতে এখানেই পতিত হয়েছিল সতীর বামনেত্রের তারা বা তারাংশ—

"তারাদ্যায়াং বামনেত্রং তারাখ্যাতারিণী পরা।
উন্মত্তো ভৈরব স্তত্র সর্বলক্ষণ সংযুতঃ।।"

চিনাচার তন্ত্র তারাপীঠকে মহাপীঠের মর্যাদা দিয়েছেন—'তারাপীঠং মহাপীঠং গন্তব্য যত্ততঃ সদা'—অর্থাৎ তারাপীঠ মহাপীঠ, যত্নপূর্বক তথাগমন করবে। নীলতন্ত্র, তারারহস্যে, সঙ্গমতন্ত্র, রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থে তারাপীঠ ও মা তারার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তবে দেবী তারা বশিষ্ঠ আরাধিত তারারূপেই বিখ্যাত।

রুদ্রযামলের কাহিনি অনুসারে মা তারার আবির্ভাব কাহিনিটি এইরকম—ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ট একবার ব্রহ্মালোকে গিয়ে পিতাকে নিবেদন করলেন—পিতা আমাকে এমন বিদ্যা বলে দিন যাতে সকল বিদ্যাও সর্বজ্ঞান লাভ করতে পারি। প্রজাপতি বললেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা হল তারা বিদ্যা। এই বলে তিনি পুত্রকে তারামন্ত্রে দীক্ষা দিলেন বশিষ্ট মা তারার বীজমন্ত্র গ্রহণ করে নীলাচল পর্বতে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক শুদ্ধাচারে সাধনা শুরু করলেন। দীর্ঘকাল সাধনা করেও তিনি সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হলেন তখন পিতৃ প্রদত্ত বীজমন্ত্রকে অভিশাপ দিলেন—এই মন্ত্রে কেউ কোনওদিন সিদ্ধিলাভ করবে না। পুনরায় ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তিনি বললেন—পিতা আপনার প্রদত্ত মন্ত্র সিদ্ধিদায়িনী নয়। ব্রহ্মা জানালেন—পুত্র তুমি তারা সাধনার আচার জান না এই সিদ্ধি পাওনি। তুমি তারার সাধনা জানান জন্য মহাচীনে যাও। সেখানে বুদ্ধরূপী জনার্দন তোমাকে সঠিক আচার-পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন। তবে তার পূর্বে তুমি মহাদেবের সাধনা করে বীজমন্ত্রকে শাপমুক্ত কর। বশিষ্ঠ তাই করলেন। বুদ্ধরূপী

জনার্দন বশিষ্টদেবকে পঞ্চমকারের (মদ্য, মৎস্য, মাংস, মৈথুন, মুদ্রা) সাধন পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে বললেন তুমি তারাপুরে যাও সেখানেই সিদ্ধিলাভ করবে, ওই স্থানে দেবীর নেত্রাংশ শিলা আছে। সে স্থান সম্পর্কে চীনাচার তন্ত্রে বলা হয়েছে—

"বক্রেশ্বরস্য ঐশান্যাং বৈদ্যানাথস্তু পূর্বতঃ।
দ্বারকায়াং পূর্বভাগে তত্র তারা অধিষ্ঠিত।।
শিলাময়িতি তদ্দেবী নিবসন শাল্মলীমূলে।"

অর্থাৎ বক্রেশ্বরের ঈশানে, বৈদ্যনাথের পূর্বে, উত্তরবাহিনী দ্বারকার পূর্ব তীরে শাল্মলী মূলে দেবীর শিলামূর্তি অবস্থিত। বশিষ্ট সাধনা শুরু করলেন কার্তিকের শুক্লা চতুর্দশীতে সিদ্ধিলাভ করলেন ও মা তারার দর্শন পেলেন। মাত্র তিন লক্ষ জপেই তারাপীঠে সিদ্ধিলাভ হয়। তারাপীঠ সিদ্ধপীঠ। অন্যের ক্ষতি ছাড়া মা তারা ভক্তে সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করেন এই পীঠে। তাই তন্ত্র গ্রন্থাদিতে তারাপীঠের কথা গোপন করা হয়েছে—এটিই জনশ্রুতি।

উক্ত কাহিনি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মা তারার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আছে। মূলত বৌদ্ধ মহাচীন তারা বা উগ্রতারাই হিন্দুদের তারাতে পরিণত হয়েছে। সাধনমালার ধ্যানের সঙ্গে তন্ত্রসারের ধ্যানের হুবহু মিল রয়েছে। তন্ত্রপীঠের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তারাপীঠে রয়েছে। মন্দিরে মা তারার ব্রহ্মশিলার উপর রূপার মুখাবয়ব প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যহ ভোরে মঙ্গলারতির পূর্ব পর্যন্ত ওই শিলামূর্তির দর্শন পান ভক্তরা। শিলাতে কোনোরূপ নেই। তবে ভক্তিসহ দর্শন করলে মা তারা কর্তৃক মহাদেবকে স্তন্যপান করানোর রূপ প্রতিভাত হয়। ওই ব্রহ্মশিলা আশ্চর্য শক্তিময়ী। স্পর্শমাত্র শরীরে দিব্যানুভূতি হয়। অতি বড় নাস্তিকেরও শরীরে শিহরণ জাগে। বশিষ্টের সিদ্ধাসনের পাশে ছোটো মন্দিরে মা তারার চরণচিহ্ন আছে। সাধক বামাখ্যাপা এইখানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

পূর্ব রেলের হাওড়া রামপুরহাটগামী যে কোনও ট্রেনে করে রামপুরহাটে আসুন। স্টেশনের পাশেই বাস, ট্যাক্সি, অটো স্ট্যান্ড। স্টেশন থেকে তারাপীঠ ১০ কি.মি.। থাকবার জন্য শতাধিক হোটেল, লজ আছে।

১১. দেবী নলাটেশ্বরী (নলহাটি)

রামপুরহাট থেকে বাসে বা ট্রেনে করে নলহাটি যাওয়া যায়। বাসের তুলনায় ট্রেনে কম সময়। রামপুরহাট থেকে আজিমগঞ্জ শাখায় নলহাটি মাত্র ১৪ কি.মি.। ট্রেনে মিনিটকুড়ি সময় লাগবে। হাওড়া থেকে সরাসরি নলহাটি স্টেশন যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে ১১/২ কি.মি. দূরে ছোটো টিলার উপর মা নলাটেশ্বরীর মন্দির। স্টেশন থেকে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে। আছে রাত্রিবাসের ব্যবস্থাও।

পীঠনির্ণয় তন্ত্রের চতুশ্চত্বারিশৎ পীঠ হল বীরভূমের নলহাটি—

"নলহাট্যাং নলাপাতো যোগী শো ভৈরবস্তুথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা।।"

সংস্কৃত 'নলক' শব্দের অর্থ 'নলের মতো লম্বা অস্থি' যার মানে নুলো বা কুনুইয়ের নিম্নভাগ। আবার শিবচরিত মতে এটি উপপীঠ। এখানে সতীর কণ্ঠনালী পতিত হয়েছিল। দেবীর নাম শেফালিকাও ভৈরব যোগীশ। মন্দিরে সতীর কণ্ঠনালী রক্ষিত আছে (প্রস্তরীভূতঃ প্রত্যহ দেবীর স্নানের পর ও মঙ্গলারতির পূর্বে উক্ত দেবী অঙ্গ ভক্তদের প্রদর্শিত হয়। তবে শাস্ত্রে দেবীকে কালিকা বা শেফালিকা যাই বলা হোক না কেন স্থানীয়রা দেবীকে ললাটেশ্বরী বলে থাকেন। ভৈরব অবশ্য সর্বত্র যোগীশ নামেই উক্ত। প্রণাম মন্ত্রে দেবীকে নলাটেশ্বরী বলেই সম্বোধন করা হয়—

"মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলং পরমম্ কলাং।
নলাটেশ্বরী বিশ্বমাতা চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্।।"

আবার টিলা বা পাহাড়ের উপর দেবী অধিষ্ঠিত বলে কেউ কেউ দেবীকে পার্বতীও বলে থাকেন।

ব্রাহ্মণী নদীর তীরে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত টিলার উপরে দেবীর চারচালা রীতির সুদৃশ্য মন্দির। ভূমিভাগ থেকে অনেকগুলি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে দেবীর মন্দিরে পৌঁছাতে হয়। টিলাটি এককালে ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এটি বর্গীডাঙা নামেও পরিচিত। এই পাহাড়েই দেবী মন্দিরের পেছনে পীর কোবলা আশা শহিদের পবিত্র মাজার আছে। তিনি বর্গীদের আক্রমণে নিহত হন। এই পাহাড়েই ছিল এক আশ্চর্য নিমগাছ। যা দেবী মন্দির ও মাজারের মাঝে অবস্থিত ছিল। গাছটির বৈশিষ্ট্য ছিল মন্দিরের দিকের পাতাগুলি তিতো কিন্তু মাজারের দিকের পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত কম তিতো, অল্প মিষ্টি স্বাদযুক্ত। বর্তমানে সে গাছ বাড়ে উৎপাটিত হয়ে গেছে। যোগীশ ভৈরবের মন্দির নির্মাণের সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে একজোড়া বিষ্ণুপদ আবিষ্কৃত হয়। এই ঘটনাকে দৈবনির্দেশ মনে করে ওই বিষ্ণুপদ দুটিকে ভৈরব মন্দিরের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে স্থাপন করা হয় এবং দেবীর বিগ্রহের দক্ষিণে বিষ্ণুশিলা স্থাপন করা হয়। প্রথমে ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম জানানোর পরই ভৈরব ও দেবীর অর্চনা হয়ে থাকে। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শিবরাত্রির দিন দেবী ও ভৈরবের মন্দির এর সঙ্গে হলুদ সূত্র দ্বারা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। স্থানটি রামায়ণ কাহিনির সঙ্গেও কিংবদন্তি দ্বারা যুক্ত। টিলাতে সীতার চুল আঁচড়ানোর দাগ আছে ও কড়িখেলার গর্ত আছে। তাই বলা যায় নলহাটি হিন্দু, মুসলমান, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের এক আশ্চর্য সমন্বয় ও সম্প্রীতির ক্ষেত্র।

১২. দেবী কিরীটেশ্বরী (কিরীটকোণা/বটনগর)

পীঠ নির্ণয়ের দ্বাবিংশশতি পীঠ কিরীট, ভারতচন্দ্র একেই কিরীটকোণা বলেছেন। তন্ত্র চূড়ামণি গ্রন্থে প্রথম এই পীঠের কথা শোনা যায়—

"ভূবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরিটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সংবর্তো ভৈরবস্তুথা।।"

মহানীল তন্ত্রে এই পীঠকে মহাপীঠের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম পটলে আছে —

"কালীঘট্টে উহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।
কিরীটেশ্বরী মহাদেবী লিঙ্গাখ্যে লিঙ্গবাহিনী।।"

আবার শিবচরিত গ্রন্থে এই পীঠকে উপপীঠ ধরা হয়েছে। দেবীর ও ভৈরবের নাম যথাক্রমে ভুবনেশী ও কিরীটি বা সিদ্ধরূপ। স্থানীয় দেবীকে কিরীটেশ্বরীও বলে থাকেন। এখানে দেবীর দুটি মন্দির। একটি পুরাতন (ভগ্নপ্রায়) একটি নতুন। মহারাজ নন্দকুমার দেবীর ভক্ত ছিলেন। মহারাজের ফাঁসির পর মন্দির মাঝ বরাবর ফেটে যায়—এমনই বিশ্বাস। নতুন মন্দিরে বেদির উপর দেবীর মুখমণ্ডল ও মস্তকে কিরীটধারী ধাতুময় বিগ্রহ আছে। পুরাতন মন্দিরে বিগ্রহ ছিল না। একটি উঁচু বেদির উপর ছোটো বেদিতে দেবী অঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। বর্তমানে দেবী অঙ্গ পাশের গুপ্তমঠে স্থাপিত। পুরোহিতদের দাবি দেবী অঙ্গ কিরীট কথার অর্থ মুকুট নয় কপাল ও শিবের সংযোগস্থল। এটিই এখানে রক্ষিত আছে। দুর্গা অষ্টমীর দিন দেবী অঙ্গকে স্নান করিয়ে পুরাতন বস্ত্র ফেলে দিয়ে নতুন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। দেবীর পূজা হয় দক্ষিণাকালীর ধ্যানমন্ত্রে।

ভৈরবের মন্দির দেবীর মন্দিরের পাশেই। ভৈরব এখানে ধ্যানরত বুদ্ধ মূর্তি। ভৈরব পদ্মাসনে উপবিষ্ট, এক হাত কোলের উপর এবং অপর হাত পাদস্পর্শ করে আছে। মস্তকে টোপর ও গলায় যজ্ঞোপবীত। এর থেকে এই পীঠের বৌদ্ধ যোগ প্রমাণিত হয়। পীঠের উত্তরে ভাগীরথী গঙ্গা প্রবাহিত। মন্দিরের ডান দিকে রয়েছে কালীসাগর নামক দিঘি। পৌষমাসের মঙ্গলবার দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরগুলির সংস্কার করেছিলেন মহারাজ দর্পনারায়ণ। দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা। নবাব মীরজাফর দেবীর চরণামৃত পান করে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। এই মন্দিরের আর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল পুরোহিতই এখানে দেবীর বলিকার্য সমাধা করেন।

মুর্শিদাবাদের লালবাগ থানার বটনগর গ্রামেই সতীপীঠ কিরীট। হাজারদুয়ারীর গঙ্গা পেরোলে অপর পাড়ে ডাহাপাড়া। ডাহাপাড়া থেকে কিছুটা গেলেই বটনগর। অন্যথায় হাওড়া আজিমগঞ্জ (২১২০ শাখায় আজিমগঞ্জ স্টেশন। স্টেশন থেকে ভ্যান রিক্সায় মন্দির ১১/২ ঘণ্টার পথ। বাসে যেতে চাইলে বহরমপুর। ওখান থেকে পলগুণ্ডিতে নেমে রিক্সায় করে মন্দির।

১৩. দেবী জয়ন্তী (জয়ন্তী ও আমতা)

পীঠ নির্ণয় তন্ত্রের একবিংশতি পীঠস্থান হল জয়ন্তী পীঠ—

"জয়ন্তাং বাম জঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।"

অর্থাৎ জয়ন্তী বা জয়ন্তায় সতীর বামজঙ্ঘা পতিত হয়েছে, দেবীর নাম জয়ন্তী এবং ভৈরব ক্রমদীশ্বর। অন্নদামঙ্গলের বর্ণনা—

"জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিল কেশব।
জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব।।"

শাক্তনন্দ তরঙ্গিনীর পঞ্চদশ অধ্যায়ে জয়ন্তীপীঠকে মহাপীঠের আখ্যা দেওয়া হয়েছে—

"কালেশ্বর মহাপীঠং মহাপীঠং জয়ন্তিকাম্"

কোথায় অবস্থিত এই জয়ন্তী পীঠ? এ নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। ১. জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস-এর অভিমত জয়ন্তী বাংলাদেশে। শ্রীহট্ট থেকে ৩৮ মাইল দূরে থামিয়া শৈলের দক্ষিণে জয়ন্তিয়া পরগনা। গ্রামের নাম বাউর ভাগ। বাম উরুভাগ থেকেই নাকি স্থানটির নাম বাউর ভাগ হয়েছে। ২. আসামের ঐতিহাসিক গেইট-এর মতো সতীর বাঁ পায়ের নিম্নাংশ পতিত হয় জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ফাজলুরে। মহানবমীর দিন এখানে নরবলি দিয়ে পূজা করা হয়। ৩. ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের ধারণা জয়ন্তী পীঠ জলপাইগুড়িতে। রাজভাতখাওয়া জংশন থেকে ১৬ কি.মি. দূরে জয়ন্তী স্টেশন। সেখান থেকে মাইল পাঁচেক গেলে তোর্ষার শাখানদী জয়ন্তী। জয়ন্তী নদীর তীরে পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা স্থানে সতী পীঠ। তিনটি গুহা। একটি মহাকাল ভৈরবের, একটি দেবী জয়ন্তীর ও একটি ত্রিদেবের। পীঠে কোনও বিগ্রহ নেই। গর্ভমন্দিরে নিচু হয়ে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরে প্রদীপের আলো। কিন্তু প্রাকৃতিক Stalactite শিলাঝুরির সৌন্দর্যে অসাধারণ। শিবরাত্রিতে এখানে মেলা বসে। আবার ৪. পূর্বা সেনগুপ্ত হাওড়া হেলার আমতার মোলাই চণ্ডীকেই পীঠদেবীর স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষপাতী। দামোদরের তীরে জয়ন্তী নামধারী গ্রাম আছে। সেখানেই দেবী অঙ্গপতিত হয়। আমতাবাসী তান্ত্রিক ছিলেন দেবীর পূজারী। বর্ষায় যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তিনি দেবীকে আমতায় এনে স্থাপন করেন। পুরোহিত ও লোকবিশ্বাস এখানে দেবীর বামপদের হাটু বা মালাইচাকি পতিত হয়েছে। মালাইচাকির ন্যায় একখণ্ড পাথরের উপর দেবীর মুখ চোখ স্থাপন করে পূজা হয়। পাশেই রয়েছে ভৈরবের মন্দির। তবে স্থানীয়রা এঁকে দুর্গেশ্বর বলে থাকেন। দেবী মোলাইচণ্ডীর বার্ষিকপূজা বুদ্ধ পূর্ণিমাতে হয়। দেবীকে কেন্দ্র করে একাধিক জনশ্রুতি ও আখ্যান আছে। আমাদেরও মনে হয় মোলাইচণ্ডীই দেবী জয়ন্তী। হাওড়া স্টেশন থেকে আমতা পর্যন্ত ট্রেন চলে। আমতা স্টেশন থেকে সামান্য পথ গেলেই মন্দির।

১৪. দেবী সিদ্ধেশ্বরী (ত্রিস্রোতা/শালবাড়ি)

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলাতেই রয়েছে অপর আর এক সতীপীঠ ত্রিস্রোতা। পীঠনির্ণয় অস্ত্র অনুসারে এটি ষোড়শ সতীপীঠ—

"ত্রিস্রোতায়াং বাম পাদো ভ্রামরী ভৈরবেশ্বর"

ত্রিস্রোতায় দেবীর বামপদ পতিত হয়েছে, এখানে দেবী ভ্রামরী এবং ভৈরব ঈশ্বর। শিবচরিত গ্রন্থে আবার ত্রিস্রোতার দুবার উল্লেখ আছে। মূল পীঠের ৪২ সংখ্যক পাঠ

ত্রিস্রোতা, এখানে দেবীর দক্ষিণজানু পতনের সংবাদ আছে, দেবী চণ্ডিকা এবং ভৈরব সদানন্দ। আবার উপপীঠের ২১সংখ্যক উপপীঠ ও ত্রিস্রোতা বলে উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে সতীর পদাংশ পতিত হয়েছিল, দেবীর নাম পার্বতী ও ভৈরব ভৈরবেশ্বর। জলপাইগুড়ির কাছে গ্রামে রয়েছে করতোয়া, জঠদা ও তিস্তা নদীর সঙ্গম। তার তীরেই দেবীর মন্দির। দেবী স্থানীয়দের কাছে সিদ্ধেশ্বরী নামে পরিচিত। কালিকাপুরাণে দেবী ভ্রামরীর ধ্যান মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রেই দেবীর পূজা হয়। ধ্যান মন্ত্রে দেবী চতুর্ভুজা ও জটাজুটধারিণী— "চতুর্ভুজা তুসা দেবী পীনোন্নত পয়োধরা/সিন্দুর পুঞ্জসংকাশং ধত্তে কর্ত্রীঞ্চ খর্গরম্/দক্ষিণে বামবাহুভ্যামভীতি বরদায়িনী/জটামণ্ডিত শীর্ষা রক্তপদ্ম পরিস্থিতা/" তবে লালবাড়ি গ্রামের শালবন পরিবেষ্টিত তপোবন সদৃশ ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে দেবীমূর্তি নীলবর্ণা, অষ্টভূজা সিংহবাহনা। ভৈরবের মন্দির নেই। তাই পূর্বা সেনগুপ্ত জলপাইগুড়ির প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ জল্পেশধামকে সতীপীঠের মযাদা দিতে আগ্রহী। জল্পেশধামের কাছে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির রয়েছে। কালিকাপুরাণে সিদ্ধেশ্বরীর কথা আছে—

"তস্যাসন্নে মহাদেবীং নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্।
সিদ্ধেশ্বরীং যোনিরূপাং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।।"

এই মন্দিরে নন্দীকুণ্ড ও দেবীর বহু প্রাচীন মূর্তি রয়েছে। জলপাইগুড়ির গোসারাপুর থেকে ১৭ কি.মি. দূরে বৈকুণ্ঠপুর। এখানে রয়েছে ভ্রামরী মন্দির। আর জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থানায় বিখ্যাত শৈবতীর্থ জল্পেশ। দুটি স্থানই ঘুরে আসুন। ভ্রামরী বা সিদ্ধেশ্বরী যাঁকে ইচ্ছা পীঠদেবী কল্পনা করুন।

১৫. জয়দুর্গা (কালীপীঠ/জুড়ানপুর)

পীঠ নির্ণয় তন্ত্রের কোনও কোনও অবার্চীন পুঁথিতে পঞ্চত্বারিশৎ শক্তিপীঠ হিসাবে কালীঘাট এর কথা আছে—

"কালীঘাটে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবস্তথা।
দেবতা জয়দুর্গাস্যা নানা ভোগ প্রদায়িনী।।"

এ কালীঘাট কলকাতার কালীঘাট নয়। একে কালীপীঠ বলাই যুক্তিযুক্ত। শিবচরিতের উপপীঠের তালিকায় কালীপীঠের কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে কালীপীঠে দেবীর শিরের অংশ পতিত হয়েছিল, দেবী এখানে চণ্ডেশ্বরী ও ভৈরব চণ্ডেশ্বর। দুটি মতের মধ্যে নামভেদ থাকলেও মূল বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সেটি হল দেবীর অঙ্গ; মুণ্ড বা শিরাংশ। আর কালিকট পীঠ যেহেতু কলকাতায় অবস্থিত সেইজন্য আরও একটি কালিকট পীঠ ভ্রমাত্বক, সেইহেতু কালীপীঠ নামকরণ অধিক বোধগম্য। যাই হোক, এই শক্তিপীঠ পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলাতে অবস্থিত। কালীপীঠের স্থানীয় নাম জুড়ানপুর। উত্তরে ভাগীরথী প্রবাহিত। তার বালুকাময় তীরে বট, অশ্বত্থ, বেল তমাল গাছের বন। নদীর অপর তীরে উদ্ধরণপুর মহাশ্মশান। জুড়ানপুর তীর্থে বটবৃক্ষ মূলে রয়েছে গোলাকার প্রস্তরখণ্ড যা

সতীর মুণ্ড বলে বিশ্বাস। পাশেই ক্রোধশি ভৈরবের মন্দির। অষ্টধাতুর জয়দুর্গা বিগ্রহ পাশে ভক্তনিবাসের মধ্যে রক্ষিত। পূজার সময় দেবীকে বটবৃক্ষমূলের বেদিতে স্থাপন করে অর্চনা করা হয়। নিরাপত্তাজনিত কারণেই দেবীকে ভক্তনিবাসে রাখা হয়। এখনও পর্যন্ত দেবীর স্বতন্ত্র মন্দির নির্মিত হয়নি। নাটোরের রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র সাধক রামকৃষ্ণ এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মাঘী পূর্ণিমায় দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ছাগ, মেষ-এর পাশাপাশি একটি করে আখ, চালকুমড়ো ও কলা বলিদানের রীতি আছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দের গুপ্তপ্রেম-পঞ্জিকার এই পীঠ সম্পর্কে লিখিত হয়েছে—"কালিঘাট : সতীর মুণ্ডু পতিত হয়। দেবীর নাম জয়দুর্গা, ভৈরব ক্রোধীশ। কাটোয়া হইতে তিন মাইল ঈশান কোণে জুরনপুরে পীঠস্থান। কলিকাতা হইতে স্টিমার ভাড়া এক টাকা।"

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত গ্রাম জুড়ানপুর। বর্ধমানের কাটোয়া শহর এ ভাগীরথী পেরোলে নদীয়ার বল্লভপাড়াঘাট। সেখান থেকে দেবগ্রামগামী বাসে মিনিট দশেকের পথ আকন্দবেড়িয়া। ওখান থেকে ৪ কি.মি. দূরে পীঠ। রিক্সা যাতায়াত করে।

১৬. দেবী বর্গভীমা (বিভাষ/তমলুক)

পীঠ নির্ণয় গ্রন্থ অনুসারে সপ্তত্রিংশৎ পীঠস্থান হল বিভাষ—

"কৃপালিনী ভীমা রূপা বামগুল্‌ফো বিভাষকে।
ভৈরবশ্চ মহাদেব সর্বানন্দ ভপ্রদঃ।।"

ইতিহাসগতভাবে বিভাষ পেশোয়ারের কাছে। তবে যেখানে ভীমা দেবী বা সর্বানন্দ ভৈরবের সন্ধান মেলেনি। সতীপীঠের প্রখ্যাত গবেষক ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার তমলুককে বিভাষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পুরানেও তাম্রলিপ্তকেই সতীপীঠের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে—

"তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর প্রান্তেচ কালী সুরধনী তটে।।"

—ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম খণ্ড, ২২ অধ্যায়

অর্থাৎ মেদিনীপুর (পূর্ব) জেলার তমলুকই সতীপীঠ। তাম্রলিপ্তের বহুনাম প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় তবে বিভাষ নাম চোখে পড়ে না। হেমচন্দ্র সুরির অভিধান 'চিন্তামনি' গ্রন্থে তাম্রলিপ্তকে 'বিষ্ণুগৃহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণুগৃহে কি কোনওভাবে বিভাষ এ পরিণত হয়েছে? দেবীকে তন্ত্রশাস্ত্রে ভীমা বলা হলেও লোকমুখে বর্গভীমা নামটিই সমাদৃত। যদিও ধ্যান মন্ত্রে দেবীকে ভীমা দেবী বলা হয়েছে, বর্গভীমা নয়। কারও মতে দেবী ভক্তকে চতুবর্গ প্রদান করেন বলেই বর্গভীমা। আবার গবেষক ড. প্রদ্যোত মাইতির মতে বৌদ্ধদেবী 'বজ্রভীমা'ই বর্গভীমতে পরিণত হয়েছেন। অস্পষ্ট কালো পাথরে দেবী মূর্তি খোদিত। স্বর্ণনির্মিত চোখ, নাক ও জিহ্বা স্থাপিত মাতৃমূর্তি আমাদের পরিচিত কালীমূর্তির ন্যায় দেবীর বেদিতে দশভুজা মহিষমর্দিনী, দ্বিভূজা দুর্গা মূর্তি, ধ্যানরত মহাদেবও সর্বানন্দ ভৈরব নামে কথিত লিঙ্গমূর্তি আছে।

দেবীর উদ্ভব সম্পর্কে একাধিক জনশ্রুতি রয়েছে। সতী অঙ্গ পতনের কাহিনির সমান্তরালে আরও যেসব কাহিনি পাওয়া যায় সেগুলি হল—১. মহারাজ তাম্রধ্বজ (মহাভারতে এই রাজার উল্লেখ আছে, যিনি পাণ্ডবদের অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটকেছিলেন)কে বৈদ্য প্রত্যহ জ্যান্ত শোলমাছ খাওয়ার বিধান দিয়েছিলেন। স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের এক মহিলা নিত্য তা যোগান দিতেন। একদিন ওই ধীবর রমণী যাত্রাকালে পথপার্শ্বের এক কুণ্ড থেকে জল তুলে মাছের হাঁড়িতে দিতেই মৃত মাছ বেঁচে উঠেছিল। দেবী ওই নারীকে এই মাহাত্ম্য প্রকাশে নিষেধ করেছিলেন স্বপ্নাদেশদানের মধ্য দিয়ে। যাই হোক, একসময় তা প্রকাশ পায়। রাজা ওই আশ্চর্য কুণ্ড দর্শনে ছুটে আসেন। দেখেন কুণ্ড নেই, কুণ্ডমুখে এক দেবীমূর্তি বিরাজিত। তিনি তখন দেবীর মন্দির নির্মাণ করে দেন। দ্বিতীয় জনশ্রুতি অনুসারে ধনপতি সওদাগর সিংহল যাত্রাকালে উক্ত কুণ্ডে পিতলের বাসন ডুবিয়ে সোনার বাসনে পরিণত করেন এবং বাণিজ্যে প্রভূত লাভ করে প্রত্যাবর্তন কালে কৃতজ্ঞতাবশত মন্দির নির্মাণ করেন। দুটি কাহিনিতেই কুণ্ডটির অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রকাশিত। আজও বর্গভীমার কুণ্ডে স্নান করলে নিঃসন্তান জননী সন্তানবতী হন এ বিশ্বাস প্রবল।

হান্টার সাহেবের অভিমত তমলুকের স্থানীয় রাজাকে পরাজিত করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ওড়িশার কালুভুঞ্যা তমলুক অধিকার করেন ও তিনিই বর্গভীমার দেউল স্থাপন করেন। মন্দিরটি ওড়িশা রীতির সপ্তরথ দেউল রীতির। তমলুকের প্রখ্যাত গবেষক উমাচরণ অধিকারীর মত—'মন্দিরটির গঠনপ্রণালী বৌদ্ধ উপাসনা গৃহের ন্যায়, মন্দির অভ্যন্তরের গঠন বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। পূর্বে মন্দিরটি বৌদ্ধবিহার ছিল। পরে সুকৌশলে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ মহাসমারোহে মন্দিরের মধ্যে কালী মূর্তি সংস্থাপন করে এক বর্গভীমার মন্দিরে পরিণত করেন।' রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দীপ্তিময় রায়, প্রদ্যোত মাইতি প্রমুখরা এই মত সমর্থন করেছেন। এর স্বপক্ষে তাঁরা বলেন, ৩৯৯-৪১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে ছিলেন এবং এর মধ্যে ২ বছর তিনি তমলুকে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে বর্গভীমার মন্দিরের কথা নেই। বরং ২৪টি বৌদ্ধমঠের কথা আছে। তবে এই তথ্যের দ্বারা সুনিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না।

দেবী বর্গভীমার নিত্যপূজা নীলতন্ত্র ও যোগিনীতন্ত্র অনুসারে সম্পন্ন হয়। মাখা সন্দেশ দিয়ে দেবীর পূজা নিবেদনের প্রথা প্রচলিত আছে। প্রত্যহ অন্ন ভোগ নিবেদিত হয়। উক্ত অন্ন ভোগে শোলমাছের পদ আবশ্যক। মকর সংক্রান্তির সময় দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১ বৈশাখ, বিপত্তারিণী, দুর্গাপূজাতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। বিধর্মী কালাপাহাড় দেবীর মন্দির ধ্বংস করতে এসেছিলেন। কিন্তু দেবীকে দর্শন করে কালাপাহাড়ের মনে মাতৃভক্তির প্রসবন জেগে ওঠে, তিনি মন্দির ধ্বংস তো দূরস্থান, মন্দিরের সেবাপূজার জন্য জায়গির দান করে ফরাসি ভাষায় এক দলিল লিখে দেন যা বাদশাহী পাঞ্জা নামে পরিচিত। যদিও সে বাদশাহী পাঞ্জা বর্তমানে পাওয়া যায়নি। মন্দিরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর-পূর্বে রূপনারায়ণ প্রবাহিত। সুপ্রাচীন কুণ্ডও বিদ্যমান।

অর্থাৎ তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্গভীমাতে রয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মেচেদা স্টেশন থেকে মন্দিরের দূরত্ব ?? কি.মি.। অথবা ৬নং জাতীয় সড়ক ধরে কোলাঘাট, ওখান থেকে ৪১নং জাতীয় সড়কে মেচেদা ৫ কি.মি.। তমলুক বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা/টোটো/পদব্রজে মন্দিরে যাওয়া যায়। তমলুকে রাত্রিবাসের একাধিক হোটেল ও লজ আছে।

১৭. দেবীকুমারী (রত্নাবলী/খানাকুল)

পীঠ নির্ণয়তন্ত্রের দ্বাচত্বারিশৎ পীঠস্থান হল রত্নাবলী—

"রত্নাবল্যাং দক্ষ স্কন্ধ কুমারী ভৈরব শিবঃ।"

শিবচরিত গ্রন্থে রত্নাবলীকে ত্রয়োদ্বিংশৎ পীঠরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে অবশ্য দেবী ও ভৈরবের নাম পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ভৈরব কুমার এবং দেবী শিবা। ভারতচন্দ্রও এক্ষেত্রে শিবচরিতের অনুগামী—

"রত্নাবলী স্থানে ডানিস্কন্ধ অভিরাম।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম।।"

অর্থাৎ রত্নাবলীতে সতীর দক্ষিণ স্কন্ধ পতিত হয়েছিল, দেবীর নাম কুমারী মতান্তরে শিবা আর ভৈরব শিব মতান্তরে কুমার।

১৯৫০ খ্রি. প্রকাশিত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার দাবি—রত্নাবলী মাদ্রাজে। কিন্তু স্থান বর্ণনা নেই। পরবর্তীতে এই দাবি অপসারিত। কারও মতে নেপালে বাগমতী ও রত্নাবলী নদীর সঙ্গমে প্রমোদতীর্থ অবস্থিত, সেটিই সতীপীঠ রত্নাবলী। তবে প্রমোদ তীর্থে দেবী ও ভৈরবের অবস্থান এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। তাই প্রমোদ তীর্থর কথা ছেড়ে অন্যত্র অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হুগলি জেলার খানাকুলের কৃষ্ণনগর গ্রামকেই শিবচরিতের রত্নাবলী বলে স্বীকৃতি জানাতে হয়। 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে রত্নাবলীর নাম আছে। সেখানে বলা হয়েছে রত্নাবলী রত্নাকর নদীর তীরে অবস্থিত। আমাদের আলোচ্য স্থানটি হুগলির রত্নাকর নদীর তীরেই অবস্থিত। কৃষ্ণনগর গ্রামটি ঘন্টেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এখানে দেবীর কোনও মন্দির নেই। পাশের গ্রাম রাধানগরে ত্রিকোণ কালীর মন্দির রয়েছে। লোকশ্রুতি ত্রিকোণ কালী তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পূজিত কালীমূর্তি। তন্ত্রসাধনার ইতিহাস অনুসারে পূর্বে দেবী কালীর কোনও মূর্তি ছিল না। স্বপ্নাদেশ মতো আগমবাগীশই প্রথম দেবীর মূর্তি কল্পনা করেন। এক অন্ত্যজ রমণীর ঘঁটে দেওয়া ও আগমবাগীশকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটার কাহিনি সকলের জানা। দেবীর স্বপ্নাদেশ মতো এই রূপ থেকেই কালীর মূর্তি কল্পিত হয়েছিল। ত্রিকোণ কালীরও এক পদ উত্তোলিত। যাই হোক এই স্থানের তান্ত্রিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তবে ত্রিকোণ কালী সতীপীঠ নয়। মহালিঙ্গাষ্টক তন্ত্রে রত্নাকর নদী ও ঘন্টেশ্বর শিবের উল্লেখ রয়েছে—

"ঘন্টেশ্বরশ্চ দেবেশী রত্নাকর নদীতটে।"

তবে তন্ত্রোক্ত ভৈরব শিব ও পীঠ দেবী শিবার প্রামাণ্য অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অনেকে ঘণ্টেশ্বর শিবকেই পীঠভৈরব বলেন। তাঁদের মতে দেবী শ্মশানবাসিনী। শক্তিপীঠের প্রখ্যাত গবেষক ড. দীনেশচন্দ্র সরকার ও সতেরবার পদব্রজী পীঠভ্রমণকারী ভূপতিরঞ্জন দাস এই স্থানকেই সতীপীঠের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রেল অথবা সড়ক পথ ধরে যে কোনও প্রান্ত থেকে আসুন হুগলির মহকুমা শহর আরামবাগে। আরামবাগ থেকে খানাকুলগামী বাসে কৃষ্ণনগর। তারকেশ্বর থেকেও সড়কপথে এখানে আসা যায়।

'পীঠ' শব্দের অর্থ 'পূজার বেদী' বা 'আসন'। কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছে—

"পীঠক্ষেত্রাগমাম্নায়ং তদ্বিদ্যারচার কৌলিকান্।
কুলদ্রব্যাদিকং দেবী ন বদেৎ পশুসন্নিধৌ।।"

অর্থাৎ পীঠের সংস্থান সাধকের দেহে। সাধনার ক্ষেত্রে এক গূঢ় তত্ত্ব। তন্ত্রশাস্ত্র বেত্তা ছাড়া অপর কেউ এ বিষয়ে উপলব্ধি করতে অসমর্থ। এখানে পীঠ শব্দ পীঠন্যাস অর্থে প্রযুক্ত। বর্ণমালার 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত ৫১টি বর্ণ উচ্চারণপূর্বক সাধক নিজ দেহের ৫১টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করেন—ওইটিই পীঠন্যাস। এর দ্বারা সাধকের স্থূল দেহ ভগবতী পূজার যোগ্য/আরাধ্যা দেবীর পূজাস্থানে পরিণত হয়। আমাদের অনুমান তন্ত্রের এই সাধনপদ্ধতি থেকেই পরবর্তীতে সতীর ৫১ দেহখণ্ডের কাহিনি জন্মলাভ করেছে। তান্ত্রিক মতে শক্তিপীঠ হতে গেলে ৪টি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন উক্ত স্থানের। যথা—উত্তরবাহিনী নদী, কুণ্ড, শ্মশান ও এক যোজন স্থানের মধ্যে ভৈরবের অবস্থান—

"যোজনভ্যন্তরে লিঙ্গম উত্তরবাহিনী নদী।
সমীপস্থ শ্মশানাঞ্চ মহাপীঠং ব্রবীমি তে।।"

এবং স্থানটি যদি কচ্ছপের পীঠের মতো হয় তাহলে তা অতি উত্তম।

অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত 'হেবহ্রতন্ত্র' গ্রন্থে জলন্ধর, ওড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি ও কামরূপ—এই চতুষ্পীঠের কথা আছে। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র 'চতুষ্পীঠ তন্ত্রে' চতুরানন্দ (চুম্বন, স্তনমর্দন, আলিঙ্গন ও নখরাঘাত—এই চার প্রকার যৌন আনন্দের কথা আছে) চতুষ্পীঠ (আত্মপীঠ, পরপীঠ, যোগপীঠ ও গুহ্যপীঠ)-এর কথা আছে। শেষোক্ত চতুষ্পীঠ হিন্দুর পীঠন্যাস সদৃশ। অর্থাৎ উক্ত চারটি পীঠ চতুরানন্দ/চতুষ্পীঠ-এর প্রতীকী ব্যঞ্জনা এরূপ ভাবা যেতে পারে।

দশম শতাব্দীতে লিখিত কালিকাপুরাণের ৬৪তম অধ্যায়েও উক্ত চারটি পীঠের কথা আছে। কালিকাপুরাণের নতুনত্ব এই যে, এখানেই প্রথম পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও ভৈরবের নাম উল্লিখিত হয়েছে (কামরূপ—দেবী কামেশ্বরী, ভৈরব কামেশ্বর; জলশৈল—চণ্ডী ও মহাদেব; পূর্ণেশ্বরী দেবী ও মহানাথ ভৈরব—পূর্ণশৈল, ওড্ডিয়ান—কাত্যায়নী ও জগন্নাথ)। একাদশ শতাব্দীতে রচিত রুদ্রযামলে পীঠসংখ্যা ১০। পূর্বের ৪টির সঙ্গে নতুন আরও ৬টি পীঠ যুক্ত হয়েছে। কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে ৪২টি সিদ্ধপীঠের কথা আছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে সিদ্ধপীঠগুলিতে পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, দেবগণ সদা বিরাজ করেন। তাই শ্রদ্ধা ও

ভক্তিপূর্বক এইসব স্থানে যাওয়া উচিত। একাদশ শতকে রচিত রুদ্রযামল গ্রন্থে ১০টি পীঠের কথা আছে। কিন্তু কোথাও সেগুলিতে সতীর দেহাংশ পতনের কথা নেই। সতীর দেহখণ্ড থেকে সতীপীঠ পতনের কথা প্রথম পাওয়া যায় কোনও তন্ত্র বা পুরাণ গ্রন্থে নয়, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে পূর্বোক্ত চতুষ্পীঠের উদ্ভব সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—"হিন্দুদের মতে মহামায়া নাকি মহাদেবের পত্নী। এ ধর্মের পণ্ডিতরা বলেন যে মহামায়া হলেন মহাদেবের শক্তির প্রতীক। গল্পে আছে যে, অপমানে আহত হয়ে দেবী নিজেকে নিজেই টুকরো টুকরো করে কেটেছিলেন। তাঁর সেই কাটা দেহ পড়েছিল চারটি স্থানে। মাথা আর কিছু অঙ্গ পড়েছিল কাশ্মীরে কামরাজের কাছে...।" অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্বেই সতীর দেহাংশকে কেন্দ্র করে পীঠ গড়ে ওঠার কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের অনুমান চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যেই সতীপীঠ সংক্রান্ত ধারণার বীজ ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করে। তবে তার সংখ্যা ৪-এর অধিক নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'পীঠনির্ণয় তন্ত্রে' এসে তা ৫১ পীঠের পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এই ধারা শেষ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত প্রাণতোষণী তন্ত্র ও শিবচরিতে এসে। শিবচরিতে আমরা ৫১টি মূল পীঠ-এর সঙ্গে আরও ২৬টি উপপীঠের কথা পাই।

আইন-ই-আকবরীর পূর্বে সমস্ত পীঠ শাক্তপীঠ। আইন-ই-আকবরীর পরবর্তীকালে শাক্তপীঠগুলিকে সতীপীঠ হিসাবে রূপান্তরকরণের কাজ শুরু হয়। ৪ থেকে পীঠসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। পীঠ বর্ণনায় রচনাকারদের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় পরস্পরবিরোধী মতামতও বৃদ্ধি পায়। পীঠ নির্ণয় ও মহাপীঠ নিরূপণ তন্ত্রে এসে পীঠসংক্রান্ত ধারণা একটা স্থিতিলাভ করে। পীঠ নির্ণয়ের পাণ্ডুলিপি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থটি সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পায়। এতেই প্রতিটি পীঠ, তার দেবী ও ভৈরবের নাম দৃষ্ট হয়। তবে অনেক প্রাচীন পীঠ এই গ্রন্থে স্থান পায়নি, কিন্তু বাংলার বহু প্রখ্যাত গ্রাম ও পীঠের মর্যাদা পেয়েছে।

সত্রীপীঠ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মত হল ৫১ সতীপীঠের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে সারা ভারতের শাক্ত উপাসকদের একচ্ছত্রছায়ায় আনার প্রয়াস। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জনপ্রিয় লোকপূজ্য মাতৃদেবীদেরই সতীর অঙ্গপতনের ক্ষীণ গল্পসূত্রে একত্রিত করার প্রয়াস থেকেই ৫১ সতীপীঠের উদ্ভব। যেমন পীঠনির্ণয় গ্রন্থ ছাড়া আর কোনও পীঠসংক্রান্ত গ্রন্থে কালীঘাটের নাম নেই, অথচ তীর্থ হিসাবে কালীঘাটের উল্লেখ বেশ প্রাচীন। পঞ্চদশ শতকের বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে কালীঘাটের উল্লেখ রয়েছে। তবে এই তত্ত্বেরও কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন—বিন্ধ্যাচল পর্বতের দেবী বিন্ধ্যবাসিনী পুরাণ খ্যাত অথচ কোনও পীঠ গ্রন্থেই তাঁকে সতীপীঠ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। ভারতচন্দ্র পীঠ নির্ণয়কে অনুসরণ করে ৫১ সতীপীঠ বর্ণনা করতে গিয়ে ৪২টি পীঠের কথা বলেছেন। প্রাণতোষণী তন্ত্র

ভক্তিপূর্বক এইসব স্থানে যাওয়া উচিত। একাদশ শতকে রচিত রুদ্রযামল গ্রন্থে ১০টি পীঠের কথা আছে। কিন্তু কোথাও সেগুলিতে সতীর দেহাংশ পতনের কথা নেই। সতীর দেহখণ্ড থেকে সতীপীঠ পতনের কথা প্রথম পাওয়া যায় কোনও তন্ত্র বা পুরাণ গ্রন্থে নয়, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে পূর্বোক্ত চতুষ্পীঠের উদ্ভব সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—"হিন্দুদের মতে মহামায়া নাকি মহাদেবের পত্নী। এ ধর্মের পণ্ডিতরা বলেন যে মহামায়া হলেন মহাদেবের শক্তির প্রতীক। গল্পে আছে যে, অপমানে আহত হয়ে দেবী নিজেকে নিজেই টুকরো টুকরো করে কেটেছিলেন। তাঁর সেই কাটা দেহ পড়েছিল চারটি স্থানে। মাথা আর কিছু অঙ্গ পড়েছিল কাশ্মীরে কামরাজের কাছে...।" অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্বেই সতীর দেহাংশকে কেন্দ্র করে পীঠ গড়ে ওঠার কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের অনুমান চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যেই সতীপীঠ সংক্রান্ত ধারণার বীজ ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করে। তবে তার সংখ্যা ৪-এর অধিক নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'পীঠনির্ণয় তন্ত্রে' এসে তা ৫১ পীঠের পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এই ধারা শেষ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত প্রাণতোষণী তন্ত্র ও শিবচরিতে এসে। শিবচরিতে আমরা ৫১টি মূল পীঠ-এর সঙ্গে আরও ২৬টি উপপীঠের কথা পাই।

আইন-ই-আকবরীর পূর্বে সমস্ত পীঠ শাক্তপীঠ। আইন-ই-আকবরীর পরবর্তীকালে শাক্তপীঠগুলিকে সতীপীঠ হিসাবে রূপান্তরকরণের কাজ শুরু হয়। ৪ থেকে পীঠসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। পীঠ বর্ণনায় রচনাকারদের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় পরস্পরবিরোধী মতামতও বৃদ্ধি পায়। পীঠ নির্ণয় ও মহাপীঠ নিরূপণ তন্ত্রে এসে পীঠসংক্রান্ত ধারণা একটা স্থিতিলাভ করে। পীঠ নির্ণয়ের পাণ্ডুলিপি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থটি সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পায়। এতেই প্রতিটি পীঠ, তার দেবী ও ভৈরবের নাম দৃষ্ট হয়। তবে অনেক প্রাচীন পীঠ এই গ্রন্থে স্থান পায়নি, কিন্তু বাংলার বহু প্রখ্যাত গ্রাম ও পীঠের মর্যাদা পেয়েছে।

সত্তীপীঠ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মত হল ৫১ সতীপীঠের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে সারা ভারতের শাক্ত উপাসকদের একচ্ছত্রছায়ায় আনার প্রয়াস। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জনপ্রিয় লোকপূজ্য মাতৃদেবীদেরই সতীর অঙ্গপতনের ক্ষীণ গল্পসূত্রে একত্রিত করার প্রয়াস থেকেই ৫১ সতীপীঠের উদ্ভব। যেমন পীঠনির্ণয় গ্রন্থ ছাড়া আর কোনও পীঠসংক্রান্ত গ্রন্থে কালীঘাটের নাম নেই, অথচ তীর্থ হিসাবে কালীঘাটের উল্লেখ বেশ প্রাচীন। পঞ্চদশ শতকের বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে কালীঘাটের উল্লেখ রয়েছে। তবে এই তত্ত্বেরও কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন—বিন্ধ্যাচল পর্বতের দেবী বিন্ধ্যবাসিনী পুরাণ খ্যাত অথচ কোনও পীঠ গ্রন্থেই তাঁকে সতীপীঠ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। ভারতচন্দ্র পীঠ নির্ণয়কে অনুসরণ করে ৫১ সতীপীঠ বর্ণনা করতে গিয়ে ৪২টি পীঠের কথা বলেছেন। প্রাণতোষণী তন্ত্র

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হলেও সেখানে পীঠের সংখ্যা ৮। তাই পীঠ সম্পর্কে আজও শেষ কথা বলার জায়গায় আমরা নেই। সে ভার স্বয়ং মহাকালের উপর। পশ্চিমবঙ্গের পীঠগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের উল্লেখ সংক্রান্ত একটি তালিকা দিয়ে আমরা আমাদের এই আলোচনা আপাতত শেষ করছি।

পীঠগ্রন্থ	*কুব্জিকাতন্ত্র*	*বৃহন্নীলতন্ত্র*	*তন্ত্রচূড়ামণি*	*পীঠনির্ণয়*	*ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*	*শিবচরিত*
সতীপীঠ						
ক্ষীরগ্রাম	✓	✓	✓	✓	✓	✓
জয়ন্তী	×	×	✓	✓	✓	✓
ত্রিস্রোতা	×	✓	✓	✓	✓	✓
অট্টহাস	×	✓	✓	✓	×	×
কালীঘাট	×	×	✓	✓	✓	✓
কালীপীঠ	×	×	×	✓	×	×
উজানী			✓	✓	✓	✓
বহুলা	×	×	✓	✓	✓	✓
রণখণ্ড	×	×	×	×	×	✓
রত্নাবলী	×	×	✓	✓	✓	✓
বক্রেশ্বর	×	×	✓	✓	×	✓
বিভাষ	×	×	✓	✓	✓	✓
নন্দীপুর	×	×	✓	✓	×	✓
নলহাটি	×	×	✓	✓	×	✓
কঙ্কালীতলা	×	×	×	✓	✓	✓
কিরাটকোণা	×	×	✓	✓	✓	✓
তারাপীঠ	×	×	×	×	×	✓

গ্রন্থঋণ :

১. The Sakta Pithas—D.C. Sircar.
২. মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে—নিগূঢ়ানন্দ।
৩. একান্নপীঠ—পূর্বা সেনগুপ্ত।
৪. ৫১ পীঠ—হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়।
৫. সতীপীঠ : উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও বর্ধমান—ড. কালীচরণ দাসও প্রবীর আচার্য।
৬. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ১—বিনয় ঘোষ।
৭. ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৮. শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা—ড. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।
৯. ইতিহাস ও কিংবদন্তিতে দেবী বর্গভীমা—ড. প্রদ্যোতকুমার মাইতি।
১০. সতীপীঠ কংকালী—সুদীপ বসাক।
১১. মহাতীর্থ অট্টহাস—পার্থসারথি কর্মকার।
১২. তারাপীঠের তারা মা—সুমন গুপ্ত।
১৩. 'সতীমাহাত্ম্যে একান্নপীঠ'—সুবর্ণ বসু, শারদীয়া পত্রিকা (১৪১৭)।
১৪. 'পশ্চিমবঙ্গের সতীপীঠগুলি কতটা জাগ্রত'—শিবশঙ্কর ভারতী, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২০০৯, ১৮ এপ্রিল।